বিবেকানন্দ ঃ উপেক্ষিত অধ্যায়

প্রদোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

গ্রন্থস্বত্ব : কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

□ প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬২

□ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

□ মুদ্রাকর : তরুণ মণ্ডল / মোনালিসা প্রিণ্টার্স
৮৩/৬ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৩৭

□ প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত / অবন বসু

কয়েকটি কথা

আঠারো বছর বয়সে পরমহংসদর্শন, তেইশ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণায়ণ, তিরিশ পর্য্যন্ত পরিব্রজন, এবং উনচল্লিশে পরায়ণ—এই বিবেকজীবন।

বিবেক-সম্ভাবনা শ্রীরামকৃষ্ণ শুরু করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, ১৮৮১ সালে। বিবেক-সম্ভব তিনিই করেছিলেন স্মূক্ষ্মশরীরে, ১৮৯৩ সালে, আচণ্ডাল ভারতবাসীর মধ্য দিয়ে।

বিবেকবিশ্লেষণে এই দ্বিস্তর শিক্ষানবিশীর গুরুত্ব অনেক। সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে সেদিকে আলোকপাত করার।

এ গ্রন্থের পরিসীমা তাই ১৮৯৩ পর্য্যন্তই।

১৮৯১ সালে বিবেকদর্শন হয় খেত্‌ড়ি-নরেশ মহারাজা অজিত সিং এর। সেদিন থেকে ১৯০৯ সালে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিবেক-প্রস্তুতিতে তাঁর অবদান যথেষ্ট। বিবেকসাহিত্যে এই অবদান যথাযোগ্য মর্য্যাদা পায়নি।

বললে বোধ হয় ভুল হবে না, যে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে খেতড়ী-নরেশ অল্প-পরিচিত নন, প্রায় অ-পরিচিত। যত্ন করেছি এই উপেক্ষিত দিকটিতে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার।

প্রভূত সাহায্য নিয়েছি Vivekananda A forgotten chapter of his life—Benishankar Sharma এবং The life of Swami Vivekananda—By his Eastern & Western diciples গ্রন্থ দুখানি থেকে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' এবং শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী' গ্রন্থ দুটিও বিশেষ সাহায্য করেছে। আর স্বামীজীর নিজের লেখা পত্রাবলী তো আছেই।

এছাড়া যে বইগুলির সাহায্য নিয়েছি তাদের উল্লেখ আছে।

মূলে যেখানে ইংরেজী লেখা ব্যবহার করেছি সেখানে বাংলা অনুবাদ আমার।

রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ দুজনেরই জীবনের গতিপথ, মনে হয় যেন পূর্বনিয়ন্ত্রিত। পার্শ্বচরিত্রগুলিও নায়কের প্রয়োজনেই যেন পূর্ব-পরিকল্পিত। এই মনে হওয়াটায় একটু জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০২, এই নয় বছর, বছর নয়, বিবেক-বিস্ফোরণের একটি সমগ্র কল্প। সাহসে কুলোয়নি সেই সময় সম্বন্ধে লেখার। চেষ্টা করার ইচ্ছা থাকল কালে দিনে।

বিবেকানন্দের জীবনে খেতড়ী পর্ব্ব নিয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমি এক আনা চেষ্টা করেছি। কেউ ষোলো আনা করলে চেষ্টা সার্থক হয়েছে, বুঝব।

এই গ্রন্থ রচনায় মূল্যবান মতামত এবং অকৃপণ উৎসাহ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী নন্দ মুখোপাধ্যায়, সহদেব সাহা, রঞ্জিৎ চক্রবর্তী এবং সুব্রত গুপ্ত।

বাড়ীতে সকলের কাছে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। বিশেষ করে আমার ছেলে এবং মেয়ে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে।

আমার সহকর্মীরাও নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন।

এইসব শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমার ঋণ থাকল।

এঁরা ছাড়া এই লেখা হয়ত সম্ভব হত না।

কিছু ভুল রয়ে গেল। পাঠক পাঠিকারা আশা করি সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

প্রদোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

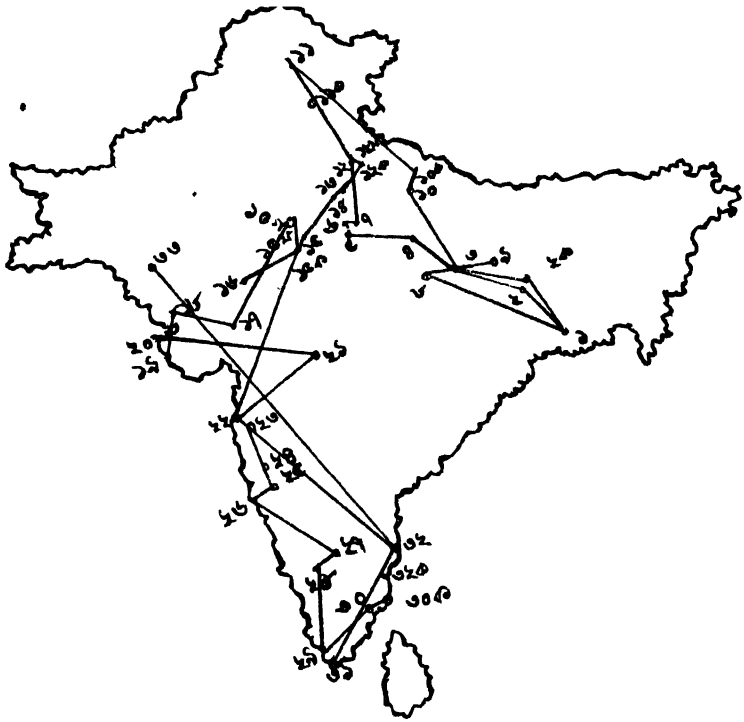
সানি পার্ক ॥ কলকাতা

আমার প্রয়াত পিতৃদেব

৺কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

স্মৃতির উদ্দেশে

পরিব্রাজক ☐ ১৮৮৭-১৮৯৩



১. বরানগর ২. বৈদ্যনাথধাম ৩. বারাণসী→বরাহনগরে প্রত্যাবর্ত্তন ৪. লক্ষ্মৌ ৫. আগ্রা ৬. বৃন্দাবন ৭. হাথরাস→বরানগরে প্রত্যাবর্ত্তন ৮. এলাহাবাদ ৯. গাজীপুর→বরানগরে প্রত্যাবর্ত্তন ২ক. ভাগলপুর ১০. নৈনিতাল ১০ক. আলমোড়া ১১. শ্রীনগর ১১ক. জম্মু ১২ক. তেহ্‌রী ১২. দেহ্‌রা-দুন ১২খ. হৃষিকেশ ১৩. মীরাট ১৪. দেহ্‌লী ১৫খ. আলোয়ার ১৫. জয়পুর ১৫ক. আজমীর ১৬. মাউণ্ট-আবু ১৫গ. খেত্‌ড়ী ১৭. আমেদাবাদ ১৮. ভূজ ১৯. পোরবন্দর ২০. দ্বারকা ২১. খাণ্ডোয়া ২২, বোম্বে ২৩. পুণে ২৪. কোল্হাপুর ২৫. বেলগাঁও ২৬. মরমুগাঁও ২৭. বাঙ্গালোর ২৮. মহীশুর ২৯. ত্রিবান্দ্রম ৩০. মাদুরাই (রামনাদ) ৩০ক. রামেশ্বরম ৩১. কন্যাকুমারী ৩২. মাদ্রাজ ৩২ক. পাণ্ডিচেরী ৩৩. হায়দ্রাবাদ

□ রামকৃষ্ণের নরেন □

'প্রতি সন্তের অতীত আছে, প্রতি পাপিষ্ঠের আছে ভবিষ্যত।'*

অবতারের অতীত নেই, কর্মভোগ নেই। অবতার স্বেচ্ছায়, সময়ের সীমাবদ্ধতায় অবতীর্ণ হন, সময় তাঁকে বাঁধতে পারে না। তিনি মায়ায় আবদ্ধ হন না।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে প্রয়োজনে ভগবান বিষ্ণু নরদেহ ধারণ করে, ধরাধামে অবতীর্ণ হন জগদ্ধিতায়, মানুষের হিত কল্পে। কিন্তু স্বেচ্ছায়, সম্ভবামি যুগে যুগে' —কর্মফলে জন্মভোগ নয়।

ঈশারউড শাশ্বত-সহচরতত্ত্বের কথা বলেছেন: হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে দিব্য জগতে অবতারদের বিশেষ বিশেষ সহচর থাকে এবং মর্ত্যলোকে নরদেহে অবতরণের সময় তাঁরা সেই সহচরদের সঙ্গে নিয়ে আসেন।

নরেন রামকৃষ্ণের শাশ্বত-সহচর। তাই ঠাকুর বলেছিলেন, যেদিন নরেন জানতে পারবে সে কে, সেদিন আর তার দেহ থাকবে না। যেদিন সে বুঝতে পারবে যে মর্ত্যলোকে কয়েক বছরের রামকৃষ্ণ-নরেন্দ্র সম্পর্ক হচ্ছে সেই অনন্ত সম্পর্কের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র সেদিন সে দেহ রেখে ফিরে যাবে অমর্ত্যলোকে।

নারায়ণ নররূপে 'সিমলেতে কায়েতের ছেলে' হয়ে আছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তা জানতেন।

জানতেন কারণ এক অপূর্ব দর্শন হয়েছিল তাঁর।

সমাধি-অবস্থায় জ্যোতির্ময় নভোলোকে, খণ্ড-অখণ্ডের রাজ্যে গিয়ে তিনি অখণ্ডলোকে প্রবেশ করেছিলেন। সেই অখণ্ডলোকে তিনি দেখলেন ধ্যানলীন সাতজন ঋষি বসে আছেন। প্রাজ্ঞ, প্রবীন।

সহসা, সেই পরিব্যাপ্ত জ্যোতিঃ পুঞ্জের কিয়দংশ ঘনীভূত হয়ে একটি দেবশিশুর আকার নিল। সেই নির্মল দেবশিশু তার কোমল হাত দুটিতে, একটি ঋষির গলা জড়িয়ে ধরল। ধ্যান ভাঙিয়ে; মুগ্ধ চোখ দুটি তুলে ঋষিকে বলল, 'আমি পৃথিবীতে চললুম, তুমি এস।'

---

* Oscar Wild.

রামকৃষ্ণ দেখলেন ঋষির দেহ থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্যোতির্বর্তিকা রূপে নেমে গেল পৃথিবীতে।

নরেন্দ্রনাথকে দেখে রামকৃষ্ণ চমকে উঠেছিলেন। এ তো সেই ঋষি!

বিবেকানন্দ এই ঋষি, রামকৃষ্ণ এই শিশু। কেন? বিবেকানন্দ বলেছেন 'তাঁর অন্তরে শুধুই জ্ঞান, বাইরে শুধুই ভক্তি। আমার বাইরে জ্ঞান অন্তরে শুধুই ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্বপ্নদর্শনের অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে নিয়েছিলেন।

সেটা ছিল রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেনের চতুর্থ সাক্ষাৎ। তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে।

মন্দির চত্বরে দক্ষিণ দিকের বাগানে নরেনকে নিয়ে ঠাকুর পায়চারী করছেন। হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন। চেষ্টা করেও নরেন চেতনার জগতকে আঁকড়ে থাকতে পারল না।

পরে ঠাকুর শিষ্যদের বলেছিলেন, সেদিন সংজ্ঞা হারাবার পর নরেনকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। নরেন কে? কোথা থেকে এসেছে? কতদিন তার শরীর থাকবে ইত্যাদি। নরেনকে তিনি তার অন্তরের অন্তরতম সত্বায় প্রবেশ করিয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছিলেন। স্বপ্নদর্শন সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ-দুজনেরই জন্মবার্তা অঘোষিত ছিল না। দুজনের ক্ষেত্রেই জাতকের সম্বন্ধে স্বপ্ন সন্দেশ পেয়েছিলেন তাঁদের পিতামাতা।

শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়; রামকৃষ্ণের পিতা; একনিষ্ঠ রঘুবীর ভক্ত। মাতা চন্দ্রমনি। ১৮৩৫ খ্রীঃ ক্ষুদিরাম গয়াতীর্থে গিয়েছিলেন বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিতে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে। স্বপ্নে দেখলেন গদাধর বিষ্ণু তাঁর দিকে তাকিয়ে বলছেন, তিনি আবার নররূপে জন্মগ্রহণ করবেন ক্ষুদিরামেরই পুত্ররূপে। মাতা চন্দ্রমনি নিজগৃহে স্বপ্ন দেখলেন তাঁর শয্যায় এক দেবকান্তি পুরুষ শুয়ে আছে। আরও দেখলেন শিব মন্দিরের ভিতর থেকে, মহাদেবের দেহ থেকে এক আলোকপুঞ্জ বেরিয়ে এসে তাঁর শরীরে প্রবেশ করল।

শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত, বিবেকানন্দের পিতা, অনেক গুণের অধিকারী। বাইবেল থেকে, ফারসি কবি হাফিজের কবিতা থেকে, আবৃত্তি, করতেন, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন।

মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী, সনাতন হিন্দুনারী শিবের পূজারিনী। পুত্রকল্পে এক

আত্মীয়কে অনুরোধ করেছিলেন, কাশীতে পূজো দেওয়ার সময় বীরেশ্বর শিবের কাছে যেন তাঁর জন্য একটু পূজো দেন। একরাতে স্বপ্ন দেখলেন, বীরেশ্বর তাঁরই পুত্ররূপে তাঁরই কাছে আসছেন।

১৮৩৬ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রদোষবেলায় মাতা চন্দ্রমনি প্রসববেদনা অনুভব করেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই যখন গড়াতে গড়াতে ঠাকুর ধানসেদ্ধ করার উনানের ভিতর চলে যান, এবং ধনী কামারনী যখন বিভূতিভূষণ গদাধরকে বের করে আনে তখন দেখে মনে হয়েছিল ছ'মাসের ছেলে। অনিন্দ্যসুন্দর, কন্দর্পকান্তি।

অন্নপ্রাশনের খরচ যুগিয়েছিল জমিদার ধর্ম্মদাস লাহা। শৈশবে গদাই ছিল সুন্দর, সুস্থ, সবল, কিন্তু একগুঁয়ে। পড়াশুনো ভাল লাগত না। গান, অভিনয়, পুতুল গড়া ; মাথুর গানে সিদ্ধহস্ত।

ধুতির কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে একা একা বেড়াতে বেড়াতে একদিন দেখল, কৃষ্ণকালো মেঘের কোলে দুধ সাদা বকের সারি। দেখে ভাব হল। সেই প্রথম সবরকম বাহ্যজ্ঞান হারাল।

সাধুসন্ত যারা পুরীধামে তীর্থদর্শন করতে যেত তারা কামারপুকুরে অতিথি-শালায় বিশ্রাম করত। বালক গদাই এদের সঙ্গ করতে ভালবাসত। শুদ্ধসত্ত্ব, চির সন্ন্যাসী ; নিষ্কলুষচিত্ত গদাধরের কাছে এঁদের সঙ্গই ভাল লাগত।

১৮৬৩ খ্রীঃ ১২ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তির দিন, রামকৃষ্ণের জন্মের ২৭ বছর পরে প্রদোষবেলায়, সূর্যোদয়ের কিছু আগে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ। পিতামহ দুর্গাচরণ মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্তকে রেখে সন্ন্যাসী হন, চিরতরে। নরেন শৈশবে ছিল অস্থির, অশান্ত। শান্ত করার জন্য, জনা দুই পরিচারকের প্রয়োজন হত। মাতা ভুবনেশ্বরী শান্ত করতেন মাথায় জল ছিটিয়ে—'শিব, শিব' বলে। রাতে ঘুমানোর সময় নরেন ভ্রূ-মধ্যে এক বিচিত্র আলোকবিন্দু দেখতে পেত, যা বড় হতে হতে সমস্ত শরীর গ্রাস করত। ধ্যানে বসত খেলাচ্ছলে, ধ্যানস্থ হত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে। ছন্নছাড়া ভবঘুরে সাধুদের প্রতি এক আত্মীয়তা অনুভব করত। হাতের কাছে যা কিছু পেত সাধুদের দিয়ে দিত। সাধু দেখলেই মাতা ভুবনেশ্বরী নরেনকে ঘরে বন্ধ করে রাখতেন।

১৮৭৭ খ্রীঃ রায়পুরে যাওয়ার সময় এক অতিদীর্ঘ মৌচাক দেখে জঙ্গলের

মধ্যে, বাহ্যজ্ঞান হারায়। ঠিক যা গদাইয়ের হয়েছিল, কৃষ্ণকালো মেঘের কোলে দুধ সাদা বকের সারি দেখে। শ্রীরামকৃষ্ণের ছাত্রাবস্থা? নেই। পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের নাটমণ্ডপে পড়াশুনা শুরু এবং শেষ। 'চালকলা বাঁধা শিক্ষা' হতে পারল না। বইয়ের পাতায় যে শিক্ষা, তার চেয়ে, গাছের পাতায়, কালি কলমের চেয়ে তুলি কলমে, আকাশে, বাতাসে, কালো মেঘের কোলে, নিসর্গ-শোভায়, মানুষের—অতিমানুষের—অমানুষের লীলাখেলায়, বিশ্বজগৎ-পিতার যে অনাবিল আনন্দরঙ্গ, তাতেই তো শিক্ষা, তাতেই ব্যুৎপত্তি।

লোকশিক্ষার জন্য যার ধরায় অবতরণ, ভগবানের মহাবতরণ, মনুষ্যজাতির উদ্ধারকল্পে, জগৎসংসারের হিতকল্পে, যার জীবন উৎসর্গীকৃত হবে। যে পৃথিবীর, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের, প্রতি পাপ, সব গ্লানি নীলকণ্ঠরূপে শরীরে ধারণ করে প্রতি মানুষের সব কষ্ট, সব দুঃখ, সব হা-হুতাশ সব হতাশা আহরণ করে, জীবন-জীবনাতীতের যূপকাষ্ঠে ঘৃতাহুতি দেবে তার শিক্ষা দিতে পারে তাঁরই বিভূতি, তাঁরই সৃষ্ট পুরুষ, তাঁরই সৃষ্ট প্রকৃতি, তাঁরই দেওয়া পাপ, তাঁরই দেওয়া পুণ্য। তাঁরই মার, তাঁরই ছাড়, তাঁরই শাস্তি, তাঁরই শান্তি।

দাদা রামকুমার ভাবলেন, ঠাকুর দেবতার মূর্তি গড়তে পারে, মাথুর গান গাইতে পারে, শিবের অভিনয় করতে গিয়ে শব হয়ে যেতে পারে, এতে তো গদাধর জীবনে দাঁড়াচ্ছে না? তাকে কলকাতায় নিয়ে চল। যা পারে সাহায্য করবে। নিত্যপূজা তো শিখেছে, যজমানি করে চালাবে, পুরুতের বংশ, পুরুতগিরি করবে।

তাই গদাই কলকাতায় চলল, দক্ষিণেশ্বরে চলল, ভবতারিণীর কাছে চলল, পরমহংস হতে চলল। ভগবান শ্রীবিষ্ণু চলল বিবেকানন্দ আনতে, ভগবৎপুত্র যীশুখ্রীষ্ট চলল তার সন্ত 'পল' আনতে, প্রচ্ছন্নের অপ্রচ্ছন্ন, অপ্রচারিতের প্রকাশিত সমাধিস্থের গতিশীল, বাঙ্ময়, প্রাণময়, সংবেদনশীল সত্তার সন্ধানে। এক চলল তার পূরকের খোঁজে।

নরেনের শিক্ষা? শুরু হয়েছিল মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর কোলে, বাংলা ইংরেজী অক্ষর পরিচয়ে, রামায়ণে, শিবের গীতে, মুগ্ধবোধ সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষায়, মাত্র সাত বছর বয়সে।

এই সাত বছর বয়সেই নরেন ভর্তি হয় বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান

ইনস্টিটিউশানে।

ছেলেবেলায় নরেন ছিল, অস্থির, কিছুটা অবাধ্য, প্রাণোচ্ছল, আমোদ-প্রিয়, এবং সব ব্যাপারেই সবার আগে। বিনা তর্কে কোনও কিছুই বিশ্বাস করত না। ব্রহ্মদৈত্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়নি তাই সে তা বিশ্বাসও করেনি।

সুঠাম স্বাস্থ্য ছিল, দেহে প্রচুর শক্তি ছিল, লাঠিখেলা, তরোয়াল খেলা, কুস্তি, দাঁড় বাওয়া, সবেতেই অসীম উৎসাহ।

গভীর মনঃসংযোগ, মেধাশক্তি অসাধারণ, অল্প সময়েই পাঠ্যবস্তু বুঝে নিতে পারত, পড়া শেষ হয়ে যেত কম সময়ে, আর খেলার জন্য সময় থাকত অফুরন্ত। খেলতে খেলতেও পড়ায় মনোনিবেশ করতে পারত। যে কোন বক্তৃতা শুনে তা হুবহু পুনরাবৃত্তি করতে পারত।

এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আর অনড় সত্যনিষ্ঠা নরেনের মার কাছে পাওয়া। সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ, বহির্মুখী প্রাণচাঞ্চল্য, সব ভয় কু-সংস্কারের বিরোধিতা, বাবার কাছে পাওয়া।

১৮৬৩ খ্রীঃ দুর্গাচরণের ভগিনী তখন জীবিতা, আনন্দে বলে উঠলেন "সেই চেহারা সেই সবই, দুর্গাচরণ কি আবার ফিরে এল ?"

এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী শিশুকে দেখে বলেছিল "বিশু বাবুর এ ছেলেটি দেবঅংশের। সমস্ত অবয়ব ও ভাবভঙ্গি দেবতারই ন্যায়। ছেলেটি বাঁচিলে ও বড় হইলে দেবতার ন্যায় কাজ করিবে।"

যাকে কখনও চোখে দেখেনি, সেই দুর্গাচরণের প্রভাব নরেনের জীবনে বড় কম ছিল না। আর এ নিয়ে তার গর্বও ছিল খুব—"তোদের বংশে কেউ সন্যাসী হয়েছে ? আমার ঠাকুরদা সন্যাসী হয়েছিলেন।"

১৮৭৯ খ্রীঃ দত্ত পরিবার রায়পুর থেকে কলকাতায় ফিরে এল। নরেন সেকেণ্ড ক্লাশ বাদ দিয়ে একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাশে ভর্ত্তি হল। ষোল বছর বয়সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করল। বাবা খুশী হয়ে একটি ঘড়ি উপহার দিলেন।

ম্যালেরিয়ায় ভোগার পরে ১৮৮১ খ্রীঃ জেনারেল এসেম্বিলিস্ ইনষ্টিটিউশান বা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ এ পাশ করল।

প্রোঃ হেষ্টী ছিলেন এই কলেজের অধ্যক্ষ্য। ওয়ার্ডস ওয়ার্থের 'এক্সকারসন্' কবিতা পড়াতে গিয়ে; কিছুতেই ছাত্রদের বোঝাতে পারছেন না, যে প্রকৃতির

প্রকৃত সৌন্দর্য্যের স্বাদ পেলে, সে সৌন্দর্য্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে, মানুষ তার পার্থিব সত্বার উর্দ্ধে উঠে অন্য এক আবেশবিভোর জগতে চলে যায়, নির্লিপ্ত হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারায়।

তখন প্রো: হেষ্টী বলেছিলেন—আমার জানা একজনই আছেন, যাকে এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে দেখেছি, তিনি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ, ক্লাশে বসে নরেন সেই প্রথম তার ভবিষ্যৎ গুরুর নাম শুনল।

প্রো: হেষ্টী বলেছেন—"নরেন সত্যিই এক প্রতিভা। আমি অনেক ঘুরেছি, কিন্তু জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রদের মধ্যেও, তার মত সম্ভাবনাময়, গুণ সম্পন্ন ছেলে চোখে পড়েনি।"

কলেজে নরেনের প্রিয় বিষয় ছিল ন্যায়শাস্ত্র, পরে দর্শন। পাশ্চাত্য দর্শনেই ঝোঁক বেশী—জন, স্টুয়ার্ট মিল, হিউম, ডেকার্টে, ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সার সবারই শিষ্যত্ব নরেন গ্রহণ করেছিল, একসঙ্গে।

বি, এ, পরীক্ষার ঠিক আগের দিন, পরীক্ষার চিন্তার চেয়ে ভগবৎ চিন্তাই মাথায় ছিল বেশী, হঠাৎ এক সতীর্থের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পরমাত্মার স্তুতি গান আরম্ভ করল। বন্ধুরা বলল কাল পরীক্ষা?' নরেন বিচলিত নয়। বি, এ, পরীক্ষা ঠিকই দিয়েছিল নরেন, পাশও করেছিল।

তবে, উত্তর জীবনে, যে সর্বত্যাগী সন্যাসী, বিশ্ববিবেকের তত্বাবিধায়ক, মনুষ্য নামধারী সকল জীবের, সকল ক্লীবের, দুর্বল হৃদয়ে যিনি 'মাভৈঃ' বলে শক্তি সঞ্চার করবেন, সেই বিরাট পুরুষের ছায়া, গাঢ থেকে গাঢ়তর হয়ে, এই সময়েই নরেনের জীবনে পড়ছিল।

যুক্তিতে ব্যাখ্যা করা মুশকিল, কিন্তু কোনও এক আশ্চর্য্য প্রভাবে, কোনও দিন পদস্খলন হয়নি, কোনও অসৎ সঙ্গ করেনি নরেন, প্রলোভন হাতের কাছে ছিল প্রয়োজনের অনেক বেশী।

নরদেহে, নরেনের সঙ্গে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে ইং ১৮৮১ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে।

রামকৃষ্ণ সুরেনের বাড়ীতে এসেছিলেন। গাইয়ের যোগাড় নেই। "ভজন গাইতে পারে, এমন কেউ নেই তোমাদের পাড়ায়?' 'আছে বৈ কি। গৌর মুখুজ্জে ষ্ট্রীটের বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন।"

গান গেয়ে পরিচয়। সেই শুরু। শেষের কয়েকদিন আগে নরেন বলেছিল।

"গুরু মহারাজের ঋণ প্রান দিয়ে শোধ করেছি। তাঁর আর কোনও দাবিদাওয়া নাই।" সেই গুরু। 'যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝত বিবেকানন্দ কি করে গেছে। কিন্তু ক'টা বিবেকানন্দ জন্মাবে?'—জীবনের শেষ দিনে স্বামীজীর অস্ফুটোক্তি।

এই বিবেকানন্দের বিয়ে দিতে চেয়েছিল বিশ্বনাথ দত্ত। পাত্র সুদর্শন, সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী, সু-শিক্ষিত, কিন্তু চেষ্টা করেও বিয়ে দিতে পারেনি পিতা বিশ্বনাথ।

নরেন রামকৃষ্ণের কথা শুনেছিল রাখালের কাছ থেকে, আর শুনেছিল কলেজের প্রোঃ হেষ্টীর কাছ থেকে।

এখন বিয়ে করতে বেঁকে বসল। পিতা বিশ্বনাথ তাকে বোঝাবার ভার দিলেন রামচন্দ্র দত্তের উপর। রাম দত্ত, আত্মীয়ও বটে, আবার আশ্রিতও বটে। পরিবারেই মানুষ হয়েছে।

ঘটকালীতে হার মানল রাম দত্ত। নরেনকে বোঝান সম্ভব হল না।

রাম দত্ত তখন নরেনকে বললেন। আধ্যাত্মিক জীবনই যদি পছন্দ তবে দক্ষিনেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণকে দেখ। এদের কেউই কিন্তু গুরুশিষ্যের সাক্ষাৎ করিয়ে দেননি। দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

অতিথি আপ্যায়নের জন্য গাইয়ে নরেনের (গান চিরকালই ভাল গাইত) ডাক পড়েছিল, সুরেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে ইং ১৮৮১ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে।

অতিথি রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ-নরেন্দ্র সম্পর্ক পূর্ব পরিকল্পিত, পূর্ব-নির্ধারিত, বিধির বিধান, অমোঘ, দৈবী-নির্দেশ। এই হয় আর কিছু হয় না। রামকৃষ্ণ না হলে বিবেকানন্দ হত না বা বিবেকানন্দ না হলে রামকৃষ্ণ হত না, এ নয়, কিন্তু অমর্ত্যলোক থেকে মর্ত্যলোকে, ঐশী, ঈশপ্রেমের এই যে স্ফুরন তা পূর্ব নিশ্চিন্ত।

তাই এই 'হঠাৎ দেখা'য় প্রতিপন্ন হল রামকৃষ্ণের স্বপ্নে দেখা সন্দেশ।

এইই 'রামকৃষ্ণায়ন'। "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্।"

বিবেকজীবন, উত্তর জীবনে এই যাঁতাকলে ঘুরেছে।

'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম' গুরুদেব নিংড়ে নিয়েছেন। গুরুদেব রক্ষা করেছেন।

'যাই প্রভু যাই'।

▫ নরেনের রামকৃষ্ণ ▫

শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে নরেন্দ্রনাথের আগমন, প্রথম সাক্ষাৎ গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক : হয়ত শাশ্বত আধ্যাত্মিকতার এই ইঙ্গিত, প্রাগৈতিহাসিক এমন কি প্রত্যৈতিহাসিক ভবিতব্য এই সম্মুখ সাক্ষাৎকার। বিশ্বাস সর্ব্বস্ব প্রাচ্য ধার্মিকতার প্রতিভূ রামকৃষ্ণ, আর সংশয়-সর্ব্বস্ব প্রতীচ্য আধুনিকতার আপাত-প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ,— ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ। স্থিতপ্রত্যয়, মাতৃকেন্দ্রিক গুরু রামকৃষ্ণ, যুক্তি মত্ত পাশ্চাত্য দর্শনের নব্যশিষ্য ; নব্যযুবা নরেন্দ্রনাথ, শিষ্য-রামকৃষ্ণের, ভেবেছিল—বিনা তর্কে নাহি দিব সূচ্যগ্র ধারণা।

স্বামী তেজসানন্দ বলেছেন "এ যেন দুটি বিপরীতমুখী ধ্যানস্রোতের পূর্ণ কুম্ভ মিলন—যুক্তি গ্রাহ্য পাশ্চাত্যের যুদ্ধং দেহী, প্রত্যয় ভাগী প্রাচ্যের প্রতি।"[১]

"শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচ্য ভারতের হৃদয়-স্বরূপ, তার আধ্যাত্মিকতা, তার অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দু, উপনিষদের ভারতবর্ষ। নরেন তাঁর কাছে এসেছিল আধুনিকতার সবটুকু অবিশ্বাস নিয়ে, প্রমাণ সাপেক্ষ অধ্যাত্মভাবের যুক্তি মনীষা নিয়ে, তবে সত্যের, শাশ্বতের, চিরায়তের তৃষ্ণা হৃদয়ে নিয়ে।

এই দুই ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শের, ব্যুৎপত্তি, রামকৃষ্ণ—নরেন্দ্রের সম্পর্কের উৎপত্তি, নরেন্দ্রনাথ—স্বামী বিবেকানন্দ। এই দুই পরস্পরবিরোধী কিন্তু পরস্পর-সম্পূরক ভাবোন্মেষের পরিণতি, নব্য-হিন্দুধর্ম, যে ধর্মে সবাই উত্তীর্ণ, অনাগত ভবিষ্যতে কেউই পাপক্লিষ্ট নয়"।[২]

শৈশবে বিলে পিতামহ দুর্গাচরণের সন্ন্যাসব্রতের কাহিনী শুনেছিল। বাল্যে মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর কোলে রামায়ণ মহাভারত পড়েছিল, শুনেছিল। কৈশোরে পূজো করেছিল রাম সীতার, ধ্যান করেছিল শিবের সাকার প্রতিচ্ছবির।

যুবা নরেন্দ্রনাথ, শিক্ষিত আধুনিক, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্রভাবিত।

১। Centenary Memorial Volume—p-46

২। The Life of Swami Vivekananda By his Eastern and western disciples.

তার গুরু মিল, ডেকার্টে, হার্বাট স্পেন্সার।

স্বাধীন চিন্তাধারার এই প্রতীচ্য ভাবস্রোত যুবামনে এক সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল। সংবেদনশীল মনে আশৈশব ধ্যানধারনার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিল যুক্তি সর্বস্ব এই পাশ্চাত্ত্য দর্শন। অথচ, শিক্ষিত ধী-মন, একে না মেনেও পারেনি। ফলস্বরূপ এমন এক অস্থিরতা পেয়ে বসেছিল নরেনকে যে প্রায় নাস্তিকতার পর্যায়ে গিয়ে পড়েছিল এ সময়।

কিন্তু সহজাত অধ্যাত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা এ যুক্তি নিয়ে তাকে স্থির থাকতে দেয়নি। অসহ্য মানসিক সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল সেই ধারণাতীত একেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধির প্রেরণা, যাঁর অস্তিত্ববাদে কিন্তু কখনই বিশ্বাস হারাতে পারেনি নরেন্দ্রনাথ। বস্তুবাদী শরসন্ধানের আবর্তে পড়ে ব্যথিত হৃদয় নরেন এ সময় একটা দুঃখহরণ প্রলেপ খুঁজেছিল. এবং সেটা এসেছিল প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবেই। অপ্রত্যাশিত এক দিক্‌দিশা থেকে।

কলেজ শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ ঘোর সংশয়ী, অবিশ্বাসী, সন্দেহবাতিক সবেতেই। দক্ষিণেশ্বরের কোনও পাগলা-সাধুর লঘু-প্রগল্‌ভতা বিনা তর্কে আর বিনা প্রমাণে মোটেই মানতে রাজী নয়।

কিন্তু আরও তো আছে, যাদের বক্তব্য যুক্তির ধোপে টেঁকে।

বস্তুবাদী পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে ভারত এক সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক গোলক ধাঁধার মধ্য দিয়ে চলছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। শাশ্বত হিন্দুসত্বা লড়ছিল স্বকীয় পরিচিতি কায়েম রাখার জন্য। গুটিকয় ধর্মীয় আলোড়ন এই ঝড়ের আগে দরমার বেড়ার কাজ করছিল।

প্রথম মঞ্চে নাবল ব্রাহ্ম-সভা পরে যার নাম ব্রাহ্ম-সমাজ। ইং ১৮২৮ খ্রীঃ রাজা রামমোহন রায় শুরু করেছিলেন।

তারপর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বাইয়ে শুরু করলেন আর্য্য-সমাজ ইং ১৮৭৫ খ্রীঃ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই ১৮৭৫ খ্রীঃব্দে মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি শুরু করলেন থিওসফিক্যাল সোসাইটি। ইনি রুশ, যদিও এ আলোড়নের শুরু নিউ ইয়র্কে।

একদিকে রক্ষণশীল, অন্ধহিন্দু. অপরদিকে যুক্তি-তাড়িত মুক্তকচ্ছ হিন্দু যুবা, দুইয়েরই মোকাবিলায় কিছুটা সফল হয়েছিল এই তিনটি আন্দোলন।

নরেনের মন কেড়েছিল ব্রাহ্ম-সমাজ, সনাতন হিন্দুধর্মের অনেকেশ্বরবাদ, মূর্ত্তিপূজা, অবতারবাদ এবং গুরুর প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ প্রচার চালিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তি এবং জাতিভেদ বিলোপের জন্যও আলোড়ন তুলেছিল।

যুক্তিবাদী, মুক্তিবাদী, নরেন ভাবল এই জীবনের সব জিজ্ঞাসার উত্তর, এই মোক্ষ, এই জগতের শান্তিঃ।

কেশব সেন, ব্রাহ্ম সমাজের প্রবক্তা, জ্ঞানী, গুণী, প্রবলব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সুবক্তা, জনমনে দাগ কাটে, সবচেয়ে বড় কথা হল নব্যযুবাদের আকর্ষণ করে।

নরেন কেশবের ক্যাম্পে নাম লেখাল। ব্রাহ্ম সমাজে নাম লেখাল। ব্রাহ্ম সমাজ নির্দেশিত পন্থায় ধ্যান শুরু করল। নরেনের ধ্যান, নরেনের সমাধি। সে কি ব্রাহ্ম সমাজের সীমার মধ্যে থাকে? তাতে নরেনের শান্তি-স্বস্তি হয়নি, কারণ ব্রাহ্মের ব্রহ্মচিন্তন শুধু অবর্ণনীয়ের বর্ণনায়, গুণাতীতের গুন-কীর্ত্তনের আবেশেই চরিতার্থ। সেখানে ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যকুলতা নেই, নেই ঈশ্বরোপলব্ধির নিমিত্ত আর্তি। ঈশ্বরানুসন্ধানের জন্য কঠোর করার কোনও রীতি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মধ্যে ছিল না।

সর্বত্যাগী চিরসন্ন্যাসীর অন্তরাত্মা তখন উদ্বেল হয়ে উঠেছে ঈশ্বর দর্শনের জন্য।

ঈশ্বরকে কেউ কি দেখেছে? কেউ জেনেছে?

মুখোমুখি হল নরেন মহার্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—মুখবন্ধ না করেই সোজাসুজি প্রশ্ন—আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

কেশব সেন-হেন পুরুষকে যিনি প্রকাশিত করেছেন সেই মহর্ষি উত্তর দিতে পারলেন না। বিব্রত হয়ে শুধু বললেন 'তোমার যোগীর চক্ষু।'

হতাশ্বাস নরেন্দ্রনাথ অন্যান্য ধর্মগুরুদের কাছেও গেল একই প্রশ্ন নিয়ে। প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেল।

মনে পড়ল সুরেন মিত্তিরের বাড়ীতে দেখা রামকৃষ্ণকে। মনে হল গেলে হয়? গিয়ে দেখলে হয়।

স্বামীজী নিজে বলেছেন :—

'কেউ যেন আক্ষেপ না করে যে তাকে বিশ্বাস করানো শক্ত! দীর্ঘ ছয় বছর আমার গুরুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ চালিয়েছিলাম আমি, ফলে এই কঠোর পথের

প্রতি ইঞ্চি আমার জানা।'

'বাল্যাবধি আমি সত্যসন্ধান করেছি। বহু ধর্মসভায় গিয়েছি। কখনও বা কারও সুন্দর ধর্মোপদেশ শোনার পর উঠে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছি—একি আপনার উপলব্ধি? না কি আপনার বিশ্বাস? আপনি কি স্থিরনিশ্চিত? —এ আমার মত, এই আমার বিশ্বাস, উত্তর পেয়েছি।

বহু বহু জনকে এই প্রশ্ন করেছি 'ভগবানকে দেখেছেন? সকলকেই প্রতারক মনে হয়েছে।

এখানে মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের একটি কথা মনে পড়ছে—ভাষার অলঙ্কার দিয়ে লম্বা লম্বা কথার জাল বোনেন পণ্ডিতেরা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নানাভাবে, ইন্দ্রিয় সুখের অনেক পন্থার মধ্যে এও একটি। এ দিয়ে মেধাশক্তির চমৎকার উপভোগ করা যায় কিন্তু এ দিয়ে অজ্ঞতার দাসত্ব থেকে মানুষ কোনওদিন মুক্তি পেতে পারে না।—

এ ভাবেই আমি ঘোর সংশয়ী হয়ে উঠছিলাম, আর তখনই, হঠাৎই, আমার দিগন্তে এই জ্যোতিষ্কের উদয় হল।

তাঁর কথা আমি শুনলাম, গিয়ে দেখলাম। একজন সাধারণ মানুষই মনে হল, বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। সাধারন গ্রাম্য ভাষায় কথা বলেন। ভাবলাম, এই মানুষ কি কখনও মহান গুরু হতে পারেন? কাছে এগিয়ে গিয়ে সেই প্রশ্ন করলাম যা সমস্ত জীবন সবাইকে করে আসছিলাম।

মহাশয় আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? উত্তর এল হ্যাঁ। মহাশয়, আপনি কি প্রমান করতে পারেন যে তিনি আছেন? তা তো পারিই। কি ভাবে? 'আমি তাঁকে দেখি যেমন এখন তোকে দেখছি, তবে আরও অনেক প্রগাঢ় ভাবে'—

মনে দাগ কাটল তৎক্ষনাৎ, জীবনে প্রথম একটি মানুষ দেখলাম যে সাহস করে বলতে পারে ঈশ্বরকে দেখেছি।

…তারপর দিনে দিনে তাঁর কাছে আসা যাওয়া শুরু করলাম। প্রকৃতই দেখলাম ধর্ম্ম সঞ্চার করা যায়। একটু ছোঁয়া, এক নজর, একটা জীবন বদলে দিতে পারে।"[৩]

উপরোক্তি আর কারও নয় স্বামী বিবেকানন্দের।

৩। My Master p-55-57।

প্রথম সাক্ষাতের (দক্ষিণেশ্বর) সংক্ষিপ্ত বিবরন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে দিয়েছেন—"পশ্চিমের দরজা দিয়ে নরেন্দ্র ঘরে ঢুকল। শরীরের দিকে নজর নেই, নেই পোষাক-আশাকের দিকে, অন্যদের মত নয়, বহির্জগত সম্বন্ধে সম্পুর্ণ উদাসীন। চোখ দেখলে মনে হয় মন সদাই অন্তদর্শন করছে—যেন তার মনের একাংশ সর্ব্বদাই অন্তর্মুখী ধ্যান করছে। কলকাতার বিষয়বহুল জগত থেকে এরকম একজন সত্বগুণী আত্মাকে আসতে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম।

মেঝেয় মাদুর পাতা হল। ওই গঙ্গাজলের ঘড়া যেখানে রাখা আছে তার পাশেই সে বসেছিল। যে বন্ধুদের সঙ্গে সে এসেছিল তারা সকলেই সাধারণ যুবক—সাধারন ভোগেচ্ছা তাদের আছে, দেখলেই বোঝা যায়।

আমার অনুরোধে কয়েকখানি গান গেয়েছিল নরেন। ব্রাহ্ম সমাজের গান :—

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে॥

গান গেয়েছিল? না। সমস্ত হৃদয় নিংড়ে ভাব নিবেদন করেছিল। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রনে রাখিনি আমার সমাধি হয়েছিল।"

ভগবান অবতার রূপে দেহ ধারন করেন জগদ্ধিতায়। নিয়ে আসেন বিশেষ বার্ত্তা জগতের হিতকল্পে। কিন্তু অবতার যেহেতু শুদ্ধ সত্বগুনের আধার তাঁর পক্ষে একা জগত জয় করা তাই সম্ভব হয় না। অধিক রজোগুণ-সম্পন্ন আর একটি আধারের প্রয়োজন হয়, তাঁর সন্দেশ বিতরনের জন্য, তাঁর বাণী প্রচারের জন্য। ঠিক যেন দেহ পরিগ্রহনে বাধ্য হয়ে মর্ত্ত্যে নেমে আসার আগে তাঁরই একাংশ আলাদাভাবে তিনিই প্রেরণ করেন তাঁরই পূরক-সত্তা হিসেবে। জগতে তাঁকে প্রকাশ করার জন্য। যথাকালে অবতার তাঁকেই খুঁজে নেন তাঁরই মুখপাত্ররূপে।

জগতের ধর্ম্ম পরম্পরা এর সত্যতা প্রমান করে। অগনিত ভক্ত শিষ্য থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্ট চিনে ছিলেন পিটারকে, কৃষ্ণ-অর্জ্জুন, বুদ্ধ-আনন্দ, গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের পূরক নরেন্দ্রনাথ।

কি রকম পূরক? স্বামীজী নিজেই বলেছেন—'তাঁর অন্তরে শুধুই জ্ঞান, বাইরে শুধুই ভক্তি। আর আমার বাইরে জ্ঞান কিন্তু অন্তরে শুধুই ভক্তি।'

দুই থেকে দুই আলাদা, কিন্তু দুয়ে মিলে চার। না মিললে চার হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণও একবার ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলেছিলেন—'লোকে বলে অদ্বৈত গোস্বামীর জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব, এখানেও যে আবির্ভাব দেখছ তা নরেনের জন্যই।'

সাংঘাতিক রকমের কলেজ শিক্ষিত, আঠারো বছরের এই বালককে দেখেই রামকৃষ্ণ বাঁধা পড়েছিলেন, আবার বেঁধে ছিলেনও শক্ত গেরো দিয়ে।

নরেনের চোখে রামকৃষ্ণের সবচেয়ে বড় আকর্ষন ছিল, ত্যাগ, পবিত্রতা এবং ঈশ্বরানুরাগ। আর গুরুর চোখে শিষ্যের বড় গুন ছিল অশেষ আত্মবিশ্বাস, পৌরুষ এবং সত্যানিষ্ঠা।

কিন্তু নরেনের প্রতিটি গুণই সাধারনের চোখে; বদ গুণে দাঁড়িয়েছিল। আত্মবিশ্বাসকে সকলে ভাবত আত্মম্ভরিতা, পৌরুষকে ভাবত বাহাদুরী, আর সত্যনিষ্ঠাকে ভাবত ভনিতা।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দর্শনের দিন থেকে কোনওদিন কখনই নরেনের ওপর আস্থা হারাননি। নরেন কে বা আসলে কী তা তিনি জানতেন এবং এও বুঝেছিলেন যে সময়ে তার আপাত-আত্মম্ভরিতা, দম্ভ এবং একগুঁয়েমী পরিণতি লাভ করবে অসীম আত্মবিশ্বাসে, লাগামছাড়া খামখেয়ালীপনা পরিণতি লাভ করবে কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রনে, আর অপরের প্রশংসা বা নিন্দায় নরেনের যে তাচ্ছিল্যভাব তার আসল কারণ তার নিষ্কলুষ হৃদয়।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকারেরা বলেছেন—'শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রাচীন ভারতের, ঔপনিষদিক ভারতবর্ষের হৃদয় স্বরূপ—শ্রীরামকৃষ্ণ এবং নরেন্দ্রনাথ, এই দুই বিরল ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শের ফলশ্রুতি স্বামী বিবেকানন্দ, নব্য ভারতের হৃদয় স্বরূপ, যে প্রাচীন মূল্যমানের পুনর্মূল্যায়ন, নব মূল্যায়ন ঘটাবে।'[৪]

এ সবই ইতিহাস। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পেয়েছিলেন নরেনকে, স্বামী বিবেকানন্দকে নয়। সেই নরেনেই যে তিনি নারায়ণ দর্শন করেছিলেন তাও নিছক ভাবভোলা ভালমানুষীর জন্য নয়।

বস্তুতঃ প্রথম সাক্ষাতের জৈব রসায়ন এরকম কোন ইঙ্গিতই বহন করেনি। আঠারো বছরের উদ্ধত যুবক কোনও ভক্তি শ্রদ্ধার টানে দক্ষিনেশ্বরে যায়নি। দীক্ষাগুরুর সন্ধান করা দূরের কথা, সে যুবক বিশ্বাসই করত না যে ঈশ্বরানুগমনের জন্য কোনও গুরুর আধ্যাত্মিক দালালীর প্রয়োজন আছে। প্রথম দিনে

৪। The Life of Swami Vivekananda By his Eastern and Western dicisples.

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি নরেনের ভাবখানা ছিল সাদামাটা কৌতূহলের, কিছুটা তাচ্ছিল্যের, অবিশ্বাসের, তবে অবশ্যই অবজ্ঞার নয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে। এ জন্মে এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।'[৫]

মূর্খ বামুনের মনে কিন্তু কোনও সংশয়, কোনও সন্দেহ ছিল না। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম পদার্পনের দিন থেকেই নরেন রামকৃষ্ণের। অনিচ্ছা, অনীহা সত্ত্বেও। আর, এই অনিচ্ছা, এই অনীহা, দূরীকরনের কোনও চেষ্টা রামকৃষ্ণ কোনওদিন করেননি। তিনি জানতেন তাঁর পূরক সত্তা নরেন্দ্র। শত প্রয়াসেও, শতসহস্র বিদ্রোহেও এ সমীকরণ বদলাবার নয়।

'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম, আমি রামকৃষ্ণের দাস, কুড়ি বছর রামকৃষ্ণের সেবা করেছি' এ সব উক্তি পরিণত বয়স্ক বিবেকানন্দের, নরেনের নয়।

কর্মযোগী বিবেকানন্দ কর্মত্যাগ হবার কিছুকাল আগে বলেছিলেন।

"যতই যা হোক্, জো,* আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক্ হয়ে শুনত, আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি; আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চির পরিচিত কণ্ঠস্বর—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্য্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে। বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজ কর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে, জীবনের প্রতি আকর্ষনও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে। রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই; প্রভু; যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক, তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়।'—যাই, প্রভু, যাই।—"[৬]

নরেন এবং আর কতিপয় শিষ্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন নিত্যসিদ্ধ, জন্ম থেকেই সিদ্ধ, বলতেন 'এরা যে শিক্ষা পাচ্ছে তা কিন্তু এদের জন্য নয়, এ শিক্ষা জগতের হিতকল্পে'।

৫। পত্রাবলী পত্র ২২৬।

* মিস জোসেফাইন ম্যাক্লিওড্।

৬। পত্রাবলী পৃঃ ৭২৬।

সত্যি নরেনের সম্বন্ধে ঠাকুরের এত উচ্চ ধারণা ছিল যে বলতেন,—'তোমরা কি করছ? তোমরা শিবনিন্দা করছ? নরেনকে কেউ বিচার করো না, ওকে কেউ বুঝতে পারবে না।'

একবার এক ভক্ত বলেছিল, নরেন খারাপ পথে চলে গেছে। ঠাকুর বললেন, 'এ ঠিক নয় নরেন খারাপ হতে পারে না, মা আমাকে বলেছেন, এরকম কথা বললে তোমাদের মুখ দেখব না—'।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, প্রলোভনে আত্মসমর্পন করার জন্য যারা জন্মগ্রহণ করে নরেন তাদের মধ্যে নয়।

সর্ব সমক্ষে নরেনের প্রশংসা করতে, পঞ্চমুখে, শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও দিন দ্বিধা করেননি।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বসেছিলেন, পরিবৃত হয়ে কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম সমাজের সুধীবৃন্দ। ঠাকুর একবার ব্রাহ্ম সুধীদের দিকে তাকালেন, একবার নরেনের দিকে। সুধীরা চলে যাওয়ার পর বললেন —'একটি শক্তির স্ফুরন কেশবকে বিখ্যাত করেছে। নরেনের মধ্যে কিন্তু আঠারটি শক্তিরই সমাহার। কেশব আর বিজয় যদি জ্ঞানের প্রদীপশিখা তো নরেন প্রদীপ্ত সূর্য্য অজ্ঞানের মোহমায়ার অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।' সর্বসমক্ষে এই অকপট প্রশংসাবাণীর প্রতিবাদ নরেন করেছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ —'ওকি আমার কথা? মা আমাকে দিয়ে বলালেন। মা তো সত্যি ছাড়া বলান না।'

গাজীপুর থেকে প্রমদাবাবুকে নরেন লিখছে, 'আর কোনও মিঞার কাছে যাইব না। এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে প্রগাঢ় সহানুভূতি বদ্ধ জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই—তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ্য অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালোবাসা আমার পিতা-মাতায় কখনও বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে।

বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা করো, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন,

নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া, সকল অপহৃত করিয়াছেন।'৭

কেউ যদি বলে, সে কি মশাই এ তো নরেনও বলে। রামকৃষ্ণ বলে ওঠেন, 'নরেন বলুক তা বলে তুই বলতে যাসনি, তুই আর নরেন এক নয়, তুই শালা যদি হবিষ্যিও খাস, আর নরেন যদি হোটেলে খায় তাহলেও তুই নরেন হতে পারবিনে'—

'নরেন আমাকে গাল দেয়, কিন্তু আমার ভিতরে যে শক্তি আছে তাকে সে মানে তাকে সে গাল দেয় না।'

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ অনেক সন্যাসীর জন্ম দিয়েছেন, অনেক গৃহীর মন কেড়েছেন, লোকশিক্ষার চূড়ান্ত করেছেন কিন্তু নরেনের ক্ষেত্রে সবই ছিল আলাদা।

এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে সত্যদর্শী ঋষি রামকৃষ্ণ ধ্যানদৃষ্টিতে নরেনের আসল পরিচয় জানার পর ; মর্তে তার অবনমনের উদ্দেশ্য বোঝার পর, তাঁর সঙ্গে এই বালকের আসল, চিরায়ত সম্পর্ক সম্যক উপলব্ধি করার পর ; নরেনকে সাধারণ প্রথায় শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। যদিও তিনি নিশ্চিত জানতেন যে জগতে নরেনের জন্ম তাঁরই কাজ করার জন্য।

শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত করার প্রয়োজন নেই নরেনকে, অনাচার, কদাচার, নরেন করতে পারে, ক্ষতি হবে না, পথের বাধা পথভ্রষ্ট তাকে করতে পারবে না। এ বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণের। অন্তিমে কি করতে হবে তাকে তা ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। 'তোর হাড় লোকশিক্ষা দেবে' বিবেকানন্দের নিজেরই ভাষায় 'জন্ম হইতেই' তাঁর প্রাণ উৎসর্গীকৃত রামকৃষ্ণের কাছে।

রামকৃষ্ণের এই দোষ বা গুণ ছিল। একনজরে বুঝে নিতেন কে শুদ্ধাত্মা আর কোন জীব নিম্নদৃষ্টি, কার হবে কার হবে না। যার হবে মনে করতেন তার শতদোষ ক্ষমার্হ, যাকে দেখতে পারতেন না তাকে দেখতেনই না। প্রকৃষ্ট উদাহরণ গিরীশ ঘোষ। গুণের ঘাট ছিল না। তিন মকারের ত্রুটো তো আদ্যোপান্ত চলত। কিন্তু নরেন আমার বারো আনা গিরীশ ঘোষ ষোলো আনা—।

৭। পত্রাবলী পত্র ৪০।

তাই মনে হয় নরেন্দ্র-রামকৃষ্ণ সম্পর্ক পূর্বনির্ধারিত, পূর্বপরিকল্পিত। এই হয় অন্য কিছু হয় না, হতে পারত না, ভবিতব্য নয়।

কিন্তু মর্ত্যলোকের দক্ষিণেশ্বর নামক তীর্থক্ষেত্রে ব্রাহ্ম নরেন্দ্রনাথের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত, প্রস্ফুটিত হয়েছিল এক মূর্খ বামুনের হাতে।

তবু নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দ হওয়ার মাঝে একটা শিক্ষানবিশীর পর্যায় ছিল, আর তা ছিল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নিগ্ধ নয়নতলে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, কঠোর সংযমে আত্ম নিয়ন্ত্রনে, আত্মত্যাগে, আত্মোৎসর্গে।

'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার, 'রু' শব্দের অর্থ আলোর দ্যোতক। অন্ধকার থেকে যিনি আলোয় নিয়ে যান তিনিই গুরু। তমস্ থেকে যিনি জ্যোতির্গমনে সাহায্য করেন তিনিই গুরু। নরেন্দ্রনাথের গুরু রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ স্বীকার করেছেন, উত্তরকালে। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু আঠারো বছর বয়সে অস্বীকার করতেই চেয়েছিল, নস্যাৎ করতেই গিয়েছিল, দক্ষিণেশ্বরে, মূর্খ বামুনের, মূর্তি 'মা'-এর, বশ্যতা স্বীকার করতে নয়। রামকৃষ্ণও নরেনের শিক্ষায় অথবা দীক্ষায় কোনও কঠোর করেননি। বিধির নির্বন্ধে কোনও অদৃশ্য শক্তিবলে নরেনের আত্ম-সংশোধনী শক্তি তার পদস্খলন হতে দেবে না, তিনি জানতেন।

তাই নিত্যসিদ্ধ নরেনের একমাত্র শিক্ষানবিশী—শুধু রামকৃষ্ণ চরিত্রের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত, মূর্খ বামুনের সঙ্গে বিশ্বাসের অবিশ্বাসের, গ্রহণ বর্জনের পাঞ্জা লড়াই। এই 'যুদ্ধং দেহী', এই 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব' ভাবই নরেনের বিশেষত্ব, বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য, রামকৃষ্ণের প্রিয় বস্তু।

□ গুরু মহারাজ □

"ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা, তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই ; তবে তিনি কি বলতেন, লোককে দেখতে দাও।···

দাদা, বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-ভাগবতে যে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। তাঁর জীবন অনন্তশক্তিপূর্ণ একটি সন্ধানী আলো ; যা ভারতের সমগ্র ধর্মভাবের উপর বিচ্ছুরিত হয়েছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্য-স্বরূপ ছিলেন এবং এক জীবনে ভারতের জাতীয় ধর্ম-জীবনের সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, সাম্প্রতিকতম পরমপুরুষ জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিত-চিকীর্ষা, উদারতার জমজমাট। কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোহহং।······তাঁর নাম বরং ডুবে যাক্, তাঁর উপদেশ (শিক্ষা) ফলবতী হোক্। তিনি কি নামের দাস?'[৮]

নামের তিনি দাস নন, সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু ভালবাসার কাঙ্গাল, ভালবেসে কাঙ্গাল, আর বিবেকানন্দের নিজের ভাষায়—'এত ভালোবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই।'

প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পরও নরেন যে আবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিল তা একমাত্র এই পরমহংসী ভালবাসার টানে।

চুম্বকই শুধু লোহাকে টানে না লোহাও চুম্বককে ডাকে।

একবার রামকৃষ্ণ নরেনের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসা বন্ধ করেন নি।

৮। পত্রাবলী পত্র।

'আমায় মাকে তুই মানিস না, আমি একটাও কথা কই না। তবু কেন আসিস?'

'এখানে আসি বলেই তোমার মাকে মানতে হবে? আমি আসি তোমাকে দেখতে ভাল লাগে, তোমাকে ভালবাসতে ভাল লাগে, তাই।'

রামকৃষ্ণ কথামৃতে একটাই সুর বার বার আবার আবারো বেজেছে—"হ্যাঁ, পাঁকা-ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি। সোজা কথা ভালবাসা। যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা। যতক্ষণ না এই ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ ফটোগ্রাফের কাঁচে কালি মাখানো হয় না। ফটোগ্রাফের কাঁচে কালি মাখানো থাকলেই যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ।

ভালোবাসা এলে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের উপর মায়ার টান থাকে না, দয়া থাকে। সংসারকে বিদেশ বোধ হয়, শুধু একটা কর্মভূমি, রঙ্গভূমি ছাড়া কিছু নয়। দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো কোন রকমেই জ্বলবে না—কেবল একরাশ কাঠিই লোকসান হবে। বিষয়াসক্ত মনই ভিজে দেশলাই।"

নরেনকে একটিবার দেখবার জন্য ছুট করে ব্রাহ্ম-সমাজে হাজির হয়ে প্রলয়-কাণ্ড বাধালেন রামকৃষ্ণ। তাঁর অপমান নরেনের বুকে বাজল।

'আমাকে ভালবাসেন বলে আপনার কাণ্ডজ্ঞান খোয়াতে হবে? ভালোবাসেন বাসুন কিন্তু নিজের দিকে খেয়াল রাখেন না কেন?' রামকৃষ্ণ মাকে জিজ্ঞেস করলেন, মন্দির থেকে ফিরে বললেন—'যাঃ শালা, তোর কথা আর লই, না মা বলে দিলেন, তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই অত ভালবাসিস। যেদিন ওর মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পাবিনে সেদিন ওর মুখদর্শন তোর অসহ্য হবে।' নারায়ণ ভেবে নারায়ণকে ভালবেসে যে পাড়ি জমাতে পারে তার আর ভয় কি?

কিন্তু তবু, তাহলেও, নরেন সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত কোনওদিন থাকতে পারেননি। নরেন আর কারও না হয়ে যায়, নরেন আর কোনও পথে না চলে যায়। সবচেয়ে বড় ভয়:—

"—নরেন নেই।'

'—নেই গেল কোথায়?'

'—মরে গেছে।'

'—বেশ হয়েছে। থাক অমনি কতক্ষণ শূন্য হয়ে। সমাধি সমাধি করে আমাকে কম জালিয়েছে। এখন ঘুরুক একটু সমাধির দেশে।'

দেহজ্ঞান ফিরে এলে টলতে টলতে ঠাকুরের কাছে উঠে এল নরেন। ঠাকুর বললেন কি রে? বেড়ানো হল একটু সমাধিভূমি? কেমন দেখলি? কিন্তু যাই বল ঘর তোকে দেখিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু দরজার চাবি এঁটে বন্ধ করে দিলাম।

—বন্ধ করে দিলেন? যেন চমকে উঠল নরেন কিন্তু তার চাবি?

'তার চাবি আমার কাছে থাকল। সে ঘরে যে তোর হামেশা যাওয়া চলবে না। তোর যে অনেক কাজ।'

—কাজ? কিসের কাজ? কার কাজ?

নরেন ঝংকার দিয়ে উঠল, 'আমার কাজ', ঠাকুর তাকালেন নরেনের চোখের দিকে। 'সে কাজ যখন ফুরোবে তখন আমিই চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ ঘর আবার খুলে দেব, দেখিস।'

'কিন্তু কাজটা কি শুনি?'

কাগজ পেন্সিল তুলে নিলেন ঠাকুর। যেন কি গূঢ় কথা জানাচ্ছেন গোপনে, এমনি করে লিখলেন। লিখলেন 'লোকশিক্ষা'। 'বয়ে গেছে' প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিল নরেন। বললে, 'পারব না, কিছুতে পারব না।'

ঠাকুর দৃঢ় স্বরে বললেন, তোর ঘাড় পারবে।"*

অদূর ভবিষ্যতে যার 'ঘাড়' সত্যিই পেরেছিল এবং যখন পেরেছিল তখন যিনি মনে রেখেছিলেন 'তাঁহাকে দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু' করিয়াছি" সেই নরেন্দ্র তার গুরুভাইদের কাছে, (বিশেষ ছোটভাইদের) কেমন ছিলেন? স্বামী নিখিলানন্দ সুন্দর বলেছেন—

"সে তাদের আদর্শ ছিল। তারা নরেনের বুদ্ধিদীপ্তিতে বিমূঢ় এবং ব্যক্তিত্বে মোহিত হয়ে যেত। প্রাণবন্ত চেহারা, পৌরুষ আর জীবনীশক্তি যেন উপচে পড়ছে, শারীরিক গঠন সাধারণের চেয়ে একটু বেশী লম্বা, একটু চওড়া কাঁধ। শক্ত চোয়াল প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ় সংকল্পের ইঙ্গিতবহ। চওড়া বুক এবং মাথার সামনের দিক একটু চওড়া, উচ্চ মানসিক শক্তির পরিচায়ক। আর, চোখ

* পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৯৭

বাঁধানো চোখ ছিল সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। রামকৃষ্ণ বলতেন কমলাক্ষ। চোখ দুটি সুস্পষ্ট, কিন্তু সমুন্নত, উদ্‌গত নয়। দৃষ্টি নিবদ্ধ অন্তরে, স্বভাবযোগীর চক্ষু। মনের ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চোখের রং বদলাত।

ধ্যানগম্ভীর দীপ্তচক্ষু কখনও লঘু চপলতায় চকৃচক করত।

বন্যপ্রাণীর স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, স্বাতন্ত্র্য ছিল গতিবিধিতে, চলনভঙ্গী কখনও ধীর, কখনও দ্রুত, মনের একাংশ সর্বদাই গভীর চিন্তায় মগ্ন। লাবণ্য ছিল দেহ-সৌষ্ঠবে পৌরুষের লাবণ্য। আর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর সঙ্গীতে যেমন মুগ্ধ করত কথায়ও রাখত মোহিত করে।

নরেন যখন গম্ভীর হয়ে থাকত তখন তার মুখ দেখে বন্ধু বান্ধবেরও ভয় করত। তর্ক করার সময় তার চোখ জোড়া জলত। নিজস্ব চিন্তারাশিতে যখন মগ্ন থাকত তখন এমন একটা নির্লিপ্তভাব ফুটে উঠত যে অন্য কেউ তার কাছে আসতে সাহস পেত না। বিভিন্ন ভাবের ভাবে নরেন ছিল কখনও অশান্ত, অধীর, কখনও এমনি কোমল, চপল, যে সকলের হৃদয় গলে যেত। তার হাসি ছিল উদার এবং সংক্রামক।

কারও কাছে নরেন ছিল স্বপ্নবিলাসী, কারও কাছে প্রেমের, সুন্দরের পূজারী, বড় ঘরের ছেলে।—"[১]

ঠাকুরের চোখে নরেন কি ছিল? তাঁর নিজের কথায়—

"ও হচ্ছে পাতালফোঁড়া শিব। ও বসানো শিব নয়। কারু পদ্ম দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু বা শতদল। কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।"

"নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল। ও বড়ো ফুটোওলা বাঁশ। খুব আধার, অনেক জিনিষ ধরে।

নরেন্দ্র খানদানি চাষা, বারো বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছাড়ে না।

নরেন্দ্র খাপখোলা তরোয়াল।

মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই। আর সব পোনা কাঠিবাটা।

অন্যেরা কলসি ঘটি, নরেন্দ্র জালা।

ওর মদ্দের ভাব পুরুষভাব। আর আমার মেদিভাব—প্রকৃতি ভাব।

নরেনের হচ্ছে ব্যাটাছেলের ভাব। নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। ও

১। Vivekananda—*A Biography-Swami Nikhilananda*—*p. 53*

হচ্ছে পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে নেয়।

নরেনের জুড়ি আর একটাও ছেলে আছে? যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি বলতে কইতে, তেমনি আবার লেখাপড়ায়। রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায় হুঁশ থাকে না। সে কি যে সে? তার ভেতর এতটুকু মেকী নেই-বাজিয়ে দেখ গিয়ে টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি দেড়টা পাশ করেছে, হয়ত ব্যাস্-ওই পর্য্যন্তই। চোখ কান টিপে কোনও রকমে পাশ করতেই যেন সব শক্তি বেরিয়ে গেছে। আমার নরেনের সে রকম নয়, সে হেসে খেলে পাশ করে যায়। ব্রাহ্মসমাজে ভজন গায় সে, আর আরদের মত নয়, সে সত্যিকারের ব্রহ্মজ্ঞানী, বুঝলে, ধ্যান করতে বসে জ্যোতি দেখে। সাধে কি আর নরেনকে এত ভালবাসি?

আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ বলে জ্ঞান করি, আর আমি ওর অনুগত।

লাল জ্যোতি দেখলুম। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র সমাধিস্থ। একটু চোখ চাইলে বুঝলাম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললাম, মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।"*

* *

কথামৃত মন্থন করলে দেখা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণের বলার কথা খুব বেশী ছিল না। যা ছিল তা বারবার বলতেন, সবসময় বলতেন।

এর একটা কারণ তাঁর যা বলার ছিল তা শুধু বলে বোঝানও যায় না, শেখানোও যায় না।

কথা তাঁর অমৃত কারণ কথাগুলি শুধু মিষ্টি কথাই প্রবচন বা উপদেশ নয়।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষের মধ্যে মান—হুঁশ সঞ্চারিত করেছেন, লোকের শিক্ষায় সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। অল্পশিক্ষিত 'লেটো' থেকে শুরু করে বিশ্ব বিদ্যালয়ের তাবড় তাবড মেধাবী ছাত্রদের শিষ্য করেছেন, জীবদ্দশায়ই সন্ন্যাসী গড়েছেন। আর জীবিত যখন রইলেন না, তখন তো তাঁর শিষ্যরা সন্ন্যাসী শব্দের অর্থটাই পাল্টে দিয়েছেন। জ্ঞানী, গুনী, বিদ্বান, পণ্ডিত

প্রতিভাধর লোকমান্য, অনেক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদের প্রভাবিত করেছেন।

, যারা শিখেছে তারা তাঁর অমৃত কথা শুনে শিখেছে, অমৃতের এই পুত্রকে দেখে শিখেছে, দিব্যধাম দক্ষিণেশ্বরে থেকে শিখেছে, তাঁকে ঠকাতে গিয়ে ঠকে শিখেছে। প্রিয়শিষ্যদের কাউকে বা ছুঁয়ে দিয়েছেন, শিক্ষা সঞ্চার, শক্তি সঞ্চার, ভক্তি সঞ্চার, ধর্ম সঞ্চার তথনই হয়ে গেছে। কারও বুকে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন, অশান্ত চিত্ত শান্ত হয়েছে, দেহ মেনেছে বশ।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তাঁকে বাদ দিয়ে নয়। তিনি যখন বেঁচে ছিলেন তখন তা ছিল না, তিনি যখন নেই তখনও তা তাঁরই মুখনিঃসৃত।

শ্রীমা শ্রীম এর কথামৃত সম্বন্ধে বলেছেন যে এ যেন ঠিক তিনি সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। যেমনটি বলতেন।

শুধু পুনর্কথন নয় কথামৃত, বলতে গেলে, ঘটনার পুনর্সংঘটন।

জীবিত কালে তিনি ছিলেন talking machine (কথা বলার যন্ত্র)।

শ্রীম'র প্রচেষ্টায় আজও সেই রেকর্ড আমরা বাজিয়ে শুনছি। কথামৃতের প্রথম খণ্ড পেয়ে স্বামীজী ১৮১৭ সনের ১১ই অক্টোবর উচ্ছ্বসিত হয়ে চিঠি লিখলেন—"তোফা হয়েছে বন্ধু, তোফা, এতদিনে আপনি ঠিক কাজে হাত দিয়েছেন। সময় বয়ে যাচ্ছে। সাবাস্। ঐ তো কাজ। কুছ পরোয়া নেই, সবকিছু দিবালোকে বেরিয়ে আসুক। বাস্তবিকই অপূর্ব। প্রচেষ্টা একেবারে মৌলিক।"

*　　　　*

"এখানকার কথা মানতে হবে—লাটুকে বললেন একদিন ঠাকুর। 'তবে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন'—লাটু বললে সরলমুখে।

তক্ষুনি গোপাল ঘোষের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লেন ঠাকুর: 'ওরে গোপাল, শোন্ লেটো কি বলে। বলে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন। এখানকার কথা কি বোঝান যায়?'

'এখানকার কথা জানবার জন্যই তো আমরা সব এসেছি।' গোপাল বললে বিনত হয়ে 'আমাদের না বললে আমরা জানব কি করে?'

ঠাকুর বললেন, এখন নয়, এখন নয়, এখানকার কথা এখন নয়, সময় হলে বুঝবে সবাই একদিন।"*

কিন্তু 'এখান'-কার কথাই 'এখান'-কার শিক্ষা, 'এখান'-কার জীবনই দীক্ষা আর 'ইনি'-ই পূজার মূর্ত্তি।

এখানকার ভৌগোলিক ঠিকানা কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর, ঐতিহাসিক নিশানা রানী রাসমনি, মথুর মোহন,·· আধ্যাত্মিক স্মারক, কালীঘর, পঞ্চবটী, নাটমণ্ডপ নবত আর সর্বোপরি এখানকার একমাত্র আকর্ষন 'এখান', এখানকার জীবন, যা বলে বোঝান যায় না।

স্বামীজী বলেছেন, 'কিন্তু তবুও, তিনি যা শিখিয়েছেন তা নয়। সেই মহত্তী জীবন যা আমরা তাঁর সান্নিধ্যে যাপন করেছিলাম। আর, সেটা তো বলে ব্যাখ্যা করা যায় না।'[১০]

'অসম্ভব, অপরকে তিলমাত্র ধারনাও দেওয়া অসম্ভব, যে কি অপরিসীম আনন্দ আমরা পেতাম, তাঁর সান্নিধ্যে, শুধু সান্নিধ্যে, প্রভুর সান্নিধ্যে,···সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, যেমন ক্রীড়াবিশারদ এগিয়ে যান প্রারম্ভিক শিক্ষানবীশের শিক্ষায়, এখনি আর কাছে জিতে গিয়ে, যেন অতি কষ্টে, আবার, তখুনি তার কাছে হেরে যান শুধু তার আত্মবিশ্বাস বাড়াবার জন্যে, ঠিক তেমনিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। তিনি বুঝতেন, মানুষের সত্ত্বা, সে যদি বামন সত্ত্বাও হয়, তবু তাতে 'আত্মন' বিরাজ করছে, যা কি না অসীম শক্তির উৎস। তিনি আমাদের মত বামনেও অবতার দেখতে পেতেন। তিনি সেই সুপ্ত অধ্যাত্মশক্তি দেখতে পেতেন যা কিনা কালে প্রস্ফুটিত, উদ্ভাসিত হবে। সেই জ্যোতির্ময় দৃশ্য আমাদের সামনে রেখে তিনি আমাদের সম্বন্ধে উচ্চতানে বলতেন, আমাদেরই কাছে, আমাদের উৎসাহিত করতেন।

আবার মাঝে মাঝে সাবধানও করতেন, পাছে আমরা তাঁর ভবিষ্যদ্দৃষ্টির

---

* পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

১০। My Master Editor's Note *Page—VIII*

অবমাননা করি, পার্থিব জঞ্জালে জড়িয়ে পড়ি। আর, তাই আমাদের নিয়ন্ত্রন করতেন আমাদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ গতিবিধি নিরীক্ষন করে।

সবটাই কিন্তু হত চুপিসাড়ে, নিঃশব্দে। এই, এইটাই ছিল, রামকৃষ্ণায়ন —তাঁর শিষ্যদীক্ষার পদ্ধতি প্রকরণ, আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবার প্রণালী।'[১১]

সব শিষ্য এক রকম নয়। সবাই নরেন নয়। প্রতিভায়, দীপ্তিতে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সামঞ্জস্যে, সান্নিধ্যে, উপলব্ধিতে, ঔদাসীন্যে, বৈরাগ্যে, আধ্যাত্মিকতায়, নরেন অনন্য।

তাই, এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাত, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তাঁদের দ্বৈত (অদ্বৈত ?) জীবনের এক চমৎকার অধ্যায়। শিষ্যকে নরেন্দ্রনাথ হতে, পরিপূর্ণ স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তরিত করার পেছনে যে গুরুবল, যে গুরু প্রভাব কাজ করেছিল, জীবপ্রেম-সর্বস্ব জগদ্বন্ধু, বিবেকানন্দকে যে বীজমন্ত্র প্রজ্জলিত করেছিল। তার জ্ঞান সঞ্চার সেই অকৃত্রিম অনাবিল অধ্যায়ে নিহিত।

পরিণত স্বামী বিবেকানন্দের নৈতিক মূল্যবোধ, অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি, অটল বিশ্বাস, অদম্য কর্মোদ্যম, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, অপার করুণা, অশেষ জীবনীশক্তি অনড় ঈশ্বরানুরাগ, এবং অবিচল স্থির প্রত্যয়ের শুরু এখানে। অক্লেশ সাধনা, অ-দূষণীয় চরিত্রবীর্য্য, অ-শোধনীয় আশাবাদ, অসীম আত্মবিশ্বাস, এবং অফুরন্ত জীবপ্রেম, শুদ্ধা-ভক্তি ঈশ্বরে, অচলা প্রত্যয় মানুষে একাগ্র-সংকল্প সিদ্ধিলাভে, নির্লোভ, নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, নিঃশেষ-নিবেদন শ্রীচরণেষু, 'মা ফলেষু' গুরুভক্তি আর দধিচীর পূর্ণাহুতির প্রেরণার উৎসভূমি দক্ষিণেশ্বর। অতিদীর্ঘ গুরুসন্ধানের পর গুরুর সন্ধান পেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। উত্তরজীবনে তাই পক্ষীমাতার মত আপন পক্ষপুটে গুরুদেব রাখবেন, এই বিশ্বাসে নির্ভয়, নির্ভর যাত্রা করেছেন বিবেকানন্দ। প্রভু পথ দেখাবেন কিনা সে প্রশ্ন ছিল প্রশ্নাতীত। আমেরিকা থেকে লিখেছেন যে, 'প্রভু ভারতবর্ষে আমাকে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনি কি

১১। Vivekananda Centenary Volume. *Page* 55

আর এখানে আমাকে পরিচালিত করিবেন না? তিনি তো করিতেছেনই।'

"তিনি শরণ দিয়েছেন, আবার কি চাই? ভক্তি নিজেই যে ফলস্বরূপা, আবার কি চাই? হে ভাই, যিনি খাইয়ে পরিয়ে, বুদ্ধি বিদ্যে দিয়ে মানুষ করলেন, যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাঁকে দিনরাত দেখলে, যে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা, আর প্রেম আর ঐশ্বর্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণামাত্র প্রকাশ তার কাছে নিমকহারামী !!! তোর বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি তিন ভাগ গল্প বই তো নয়······অমন ঠাকুরের দয়া ভোল!···কেষ্ট যীশু জন্মেছিলেন কিনা তার কোনই প্রমাণ নাই, আর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়?······দেশে দেশে নাস্তিক পাষণ্ডে তাঁর ছবি পূজা করছে, আর তোদের মতিভ্রম হয় সময় সময়? তোদের মত লাখ লাখ তিনি নিঃশ্বাসে তৈরী করে নেবেন। তোদের জন্ম ধন্য, কুল-ধন্য দেশ ধন্য, যে তাঁর পায়ের ধুলা পেয়েছিস।······তিনি যে রক্ষে করছেন, দেখতে পাচ্ছি যে, ওরে পাগল, পরীর মত মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা—এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে? না, তিনি রক্ষা করছেন?······যাঁর তাঁকে বিশ্বাস নাই আর মা ঠাকুরাণীতে ভক্তি নাই তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাংলা বললুম মনে রেখো"।[১২]

—মা-ঠাকুরাণীও জানতেন "না মেনে থাকবার যো আছে কি বাবা? তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা।"

রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে ঠিক কি কি শিখিয়ে উত্তরজীবনের বিবেকানন্দে মন্ত্রান্তরিত করেছিলেন, তার খুঁটিনাটি কোথাও উল্লেখ নেই। সন্ন্যাসধর্ম্ম তিনি কোনও শিষ্যকেই দিয়ে যাননি। কোনও সন্ন্যাসীর নামকরণও তিনি করেননি। আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যদের যথাবিধি দীক্ষাদান অথবা মন্ত্রগুপ্তি কোথাও নথিবদ্ধ নয়।

গুরুগৃহে অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে আশ্রমে কঠিন নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে রেখে শিষ্যদের কঠোর তপশ্চর্য্যা যে তিনি করাননি তা শুধু কথামৃত পড়লেই বোঝা যাবে। বাধ্যবাধকতা কিছুই ছিল না, আসা যাওয়ার ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। আচার আচরণে বারণ কোনও ছিল না, এমনকি ধর্ম্মবিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসের ব্যাপারেও কোনও বাছবিচার ছিল না। সাকার, নিরাকার সব

১২। পত্রাবলী পত্র—২২৬

মিলেমিশে একাকার। দক্ষিণেশ্বরের ধারে কাছে আসার অনেক আগেই গিরীশ ঘোষ 'ম' কারে সিদ্ধি লাভ করেছিল। কালীঘরের ধারে-পাশে নরেনকে নিয়ে যেতে সময় লেগেছিল। হাজরা জ্ঞানী না কপট এ বিচার প্রায়ই লেগে থাকত। হৃদে তো মাতুলভাগ্যে আখের প্রায় গুছিয়ে নেওয়ারই স্বপ্ন দেখেছিল।

'জীব সব নিম্নদৃষ্টি'—কিন্তু তারা অবাধেই দক্ষিণেশ্বরে চলে আসত আর সময় অসময় নির্বিশেষে রামকৃষ্ণ তাদের কাছে ছিলেন যেন talking machine (কথা বলার যন্ত্র)।

ধমক ধামক বিশেষ কাউকে দিতেন কিনা অথবা শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য কাউকে পরিত্যাগ করেছিলেন কিনা রামকৃষ্ণ, বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে যেটুকু প্রমাণাদি পাওয়া যায় তাতে মনে হয় সেরকম কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

তার কারণ চোখের সামনে যদি দেখি একটি মানুষের প্রতিটি প্রশ্বাস ভগবান বলছে, আর যখন কথা বলছেন না তখন দেহের প্রতিটি অনুকণা ভগবৎভাবে নিষ্কম্প হয়ে আছে, যদি দেখি আমি যাই চিন্তা করি না কেন, যাই বলি না কেন, যত বিরুদ্ধ মতই যত রূঢ়ভাবে প্রকাশ করি না কেন, তিনি তাঁর ভাবেই আছেন এবং আমার অদম্য ইচ্ছা থাকছে তাঁরই কথা শোনার জন্য, তাঁরই মত মানার জন্য, তাহলে শাসনের প্রয়োজন কোথায় ?

জীবে প্রেম ঠাকুরের যেমন শিক্ষা তেমনি সেই সঙ্গে জীবের সব দোষ সব দুর্বলতা, সব ঔদ্ধত্য, সব দীনতা ক্ষমা করে দাসোঅহং হয়ে থাকা, তাও তাঁরই শিক্ষা। মান-হুঁশ যার সত্যিই আছে অপমান তার গায়ে তো লাগে না।

* * *

'বাড়িটা ছোট কিন্তু হৈ চৈ প্রচণ্ড। তার উপর কে একজন বড়লোক এসেছে ল্যাণ্ডো করে, তাকে দিয়ে দীননাথের ঘরগুষ্টি ভীষণ ব্যস্ত। এমন সময় এদের দেখে ওদের অপ্রস্তুত অবস্থা। কোথায় বসায় এই অনাহূতকে ? নিমন্ত্রণ না করলেও যে চলে আসে পথ চিনে, প্রার্থনার অপেক্ষা না করে ? কোথায় বসাই ? ঘরে যে অনেক জিনিস, অনেক আসবাব সেখানে জায়গা কোথায় ?

পাশের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন মথুরবাবু, ওপাশ থেকে কে ঝাঁজিয়ে উঠল :

"ও ঘরে হবে না ; ও ঘরে সব মেয়েরা আছেন।

মহা অপ্রস্তুত ! জায়গা হল না রামকৃষ্ণের। তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন মথুরবাবু।

'কেমন দেখলে ?' চটে গিয়েছেন মথুরবাবু।

রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল। বললে, 'কেন দীননাথকেই দেখলাম। তিনি দীননাথ, তিনি কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারেন ?

'আর বোলো না। বসতে জায়গা দিল ঘরে ?'

'ঘরে জায়গা না দিক হৃদয়ে দিয়েছে।'

তবু রাগ যায় না মথুর বাবুর 'তোমাকে যারা স্থান না দেয়—'

'আমাকে স্থান না দিলে স্থান কোথায় আর সংসারে ?' দীননাথের মতই হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ।"*

* * * *

"ভালবেসে যে এলেন, এই তথ্যটি তাঁর বিশেষ হওয়ার তত্ত্বটি (অবতারতত্ত্ব) না মেনে নিলে ঠিক ধারণা হয় না। কিন্তু এসে যে কি ভালটাই বাসলেন, তা তো সবার চোখের সুমুখেই হল।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ইহাবতরণ জীবের প্রতি প্রেমের টানে, জীবশিক্ষার জন্য, জীবোদ্ধারের কারণে।

'প্রথম জীব ইব রূপে যখন ঈশ প্রেমে উন্মত্ত হয়েছিলেন, তখন দিনের শেষে নিদারুণ যন্ত্রণায় মাটীতে মুখ ঘষে কাঁদতেন আর বলতেন : আর একটি দিন গেল মা ; তবু তোর দেখা পেলুম না।

সাধনশেষে আপন ঈশত্ববোধে আরূঢ় হয়ে আবার হলেন প্রেম-উন্মত্ত। সেই একই আর্তি। বেদনায় মাটিতে মুখ ঘষা নয়, এখন সন্ধ্যারতির সময়ে কুঠির উপর থেকে আকাশের একান্তে অন্তরের নিগূঢ় ক্রন্দন আমন্ত্রণ ছড়িয়ে দেওয়া : ওরে তোরা কোথায় আছিস আয়, তোদের ছাড়া আমি আর থাকতে পারছিনে !'

যে উদ্দাম প্রেমপ্রবাহ বারো বছর ভগবন্মুখী ছিল তার মোড় ফিরল জীবমুখী হয়ে।

* পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ—২০

এই আর্তির আহ্বানে যারা এসেছিল নরেন্দ্র তাদের মধ্যমণি। আর তাই নরেন্দ্রকে রামকৃষ্ণের মূলপাঠ এই জীবে প্রেম।

দয়া নয়, দাক্ষিণ্য নয় প্রেম। জীবকে শিবজ্ঞান করে প্রেম। ঈশবৎ প্রেম সর্বজীবে।

এই সীমাহীন সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বংসহা প্রেমের সঠিক রূপটি স্বামীজী চিনেছিলেন।"[১৩]

'খণ্ডন-ভব-বন্ধন' স্তোত্রে ঠাকুরের যে ভাবরূপ তিনি এঁকেছেন, তাতে বলেছেন 'চির উন্মদ প্রেমপাথার' নরেনকেও চির-উন্মদ করে গিয়েছিলেন এই প্রেমের ছোঁয়ায়।

এই নির্ভেজাল জীবপ্রেমের অত্যাবশ্যক ফলশ্রুতি-জীবনিন্দা হল শিবনিন্দা।

'নগণ্য পিঁপড়ের পর্য্যন্ত নিন্দে করো না···পোকাটিরও না।'

এই প্রেমের আর এক প্রকাশ—যত মত তত পথ। স্বাধীন মত পোষণের অধিকার প্রত্যেক জীবের আছে কিন্তু শতমুখে শতপথে জীব একই সাগরে গিয়ে বিলীন হবে। তখন 'নুনের পুতুল' গলে গিয়ে সচ্চিদানন্দময় হয়ে উঠবে।

আরও গভীরে এর কারণ—তিনিই সব হয়েছেন। জীব-জগৎ-বস্তু সমুদয় তিনি এবং তিনিই সেই অখণ্ডমণ্ডলাকার··।

"ভবতারিণীর জন্য এককালে যত কেঁদেছিলেন (রামকৃষ্ণ) কায়েতের ছেলে নরেনের জন্য তার চেয়ে কম কাঁদেননি। মা—মা করে কত বিনিদ্র রজনী যাতনায় কাটিয়েছিলেন, নরেন—নরেন করে সারারাত গামছা নিঙড়ানোর মত মোচড় দেওয়া যন্ত্রনাও অনুভব করেছিলেন।

সমদর্শন ঠাকুর কেন যে নরেন্দ্র-ব্যাপারে অতিমাত্রায় অসমদৃষ্টি হয়েছিলেন, এটি তাঁর তিরোধানের বহু পরে লোকে বুঝতে শুরু করেছিল।···

নরেনে আসক্তি ওকে ত্যাগে দীক্ষিত করার জন্যেই। (তিনি) জানতেন নরেনের কাছে যা গচ্ছিত রাখা যাবে তাই পৌছবে সকল মানুষের কাছে। সকলকে নিজের ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী করবেন বলেই নরেনকে বেশী ভালবাসতে হয়েছিল। আম খেয়ে মুখ মুছে বসে থাকে, রসগোল্লা আনতে

১৩। স্বামী বুধানন্দ—ঠাকুরের নরেন, ও নরেনের ঠাকুর

বললে রসটুকু চুষে আনে, এমন সব আধারে কি ঈশপ্রেম সংবহন চলে ?"[১৪]

প্রথম দিনেই দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রকে সবকিছু ঐশ্বর্য দিতে চেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ কিন্তু বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে 'বিলে' কেঁদেছিল—'বাড়িতে যে আমার বাপ মা আছে ?'

পাঁচ বছর পরে কাশীপুরে তাই সব দিয়ে, ফকির হয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। আর অত্যপ্রাপ্ত ইতিহাস অনুযায়ী অপর কাউকে এমন করে দেননি।

নরেন্দ্রকে উত্তরাধিকারী আধার করার বড় বাধা বোধ হয় ছিল কালী না মানা। তাই একদিন তাকেই ভিক্ষার্থ কালীঘরে পাঠিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন আদ্যাশক্তি বাদ দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কালী মানার পরে নরেন মায়ের ঘরের ছেলে হল। আর ভয় নেই। স্বামী বুধানন্দের ভাষায়, 'বিশ্বজননী ঐ যে একবার নরেনের চৈতন্যে চাপলেন সারাজীবনে আর নামবার নামটি করলেন না।'

জগৎ ভুলে সমাধিভূমিতে চড়ে থাকতে চেয়েছিলেন নরেন্দ্র. সদা সর্বদা নির্বিকল্প জগতে বিচরণ করবেন। রূঢ় ধিক্কারে ঠাকুর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—আত্মানন্দে বুঁদ হয়ে থাকার অধিকার নরেন্দ্রের নেই। পরে যদিও একবার সমাধিভূমিতে বিচরণ করলেন তাও ঠাকুর চাবিকাঠিটি কেড়ে রেখেছিলেন।

'ঈশ্বরদর্শনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য'—কিন্তু নরেন সাধারণ মনুষ্য বা সাধারণ সাধক নয়। অখণ্ডের ঘর থেকে তার সত্তাকে মর্ত্যের আধারে নামিয়ে আনার এক উদ্দেশ্য মায়ের কাজ অথবা ঠাকুরের কথায় আমার কাজ—তাই তিরোধানের দুদিন আগে শিষ্যকে সব বিলিয়ে দিয়ে গুরু শিষ্যে অনুস্যূত হলেন, নরেনের আলাদা অস্তিত্ব আর রইল না নরেন রামকৃষ্ণাত্মা হলেন।

নিজের জীবনে রামকৃষ্ণ বৈজ্ঞানিক, বৈপ্লবিক অথবা সনাতন ধর্মের গোঁড়ামী বিরোধী মনোভাব কম দেখাননি। ধনী কামারনীর ভিক্ষাগ্রহণ, চালকলা-বাঁধা-বিদ্যা-অস্বীকার, ইসলাম-সাধন, সহধর্মিনীতে ঈশ্বরপূজা, জীব-শিব মন্ত্রদান, ভাঙ্গা পা জোড়া লাগিয়ে রাধাগোবিন্দের মূর্তিপূজা, এ সবই বৈপ্লবিকতার বৈজ্ঞানিকতার সাক্ষ্য বহন করে।

বিবেকবাণী যে অগ্নিবীণা তার দীপশলাকা জ্বালিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

নরেনের যা ছিল তাই যথেষ্ট ছিল তাই দিয়েই নরেন্দ্র-সাধনা করেছিলেন

১৪। স্বামী বুধানন্দ—ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর,

শ্রীরামকৃষ্ণ। জোর করে নয়, জেদ ধরে নয় শুধু সঙ্গদোষে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হয়ে উঠেছিল।

নব্যযুবা নরেন্দ্রকে 'চির উন্মদ প্রেমাগ্নিতে দগ্ধ করে এই সন্ন্যাসী' বিশ্বময় ছড়ায়ে' দিয়েছিলেন।

স্বামী বুধানন্দ—'গলায় ক্যান্সার নিয়ে যে এত শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে-ছিলেন, তার একটি কারণ এও হতে পারে যে নরেন্দ্র-সাধনে তখনও কিছুটা বাকী ছিল। মহাসমাধির কয়েকদিন মাত্র আগে নরেনের হয় নির্বিকল্প সমাধি। কালী মেনে নেওয়ার পর এটি হল সর্বপূর্তি। আর কালবিলম্ব করলেন না ঠাকুর।'

শেষ সংশয় ভাঙ্গলেন নরেন্দ্রের : অন্তিমশয্যায়—

"অনেক সময় বলেন তিনিই সেই ছদ্মবেশে, রাজ্যভ্রমণে এসেছেন। তিনিই ভগবানের অবতার, তিনি পুরুষোত্তম। এখন সে কথা কি তিনি ঘোষণা করতে পারেন? এই অসহন রোগক্লেশের মধ্যে এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে?

নরেনের হঠাৎ মনে হল, এখন যদি প্রকাশ করে বলেন, বলতে পারেন, তাহলে বুঝি। তবেই বিশ্বাস করি।

এখনো তোর জ্ঞান হল না? নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে কমলবিশদ প্রসন্ন চোখ মেলে ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে। বললেন: এখনো তোর সংশয়? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানিং এ শরীরে রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।'

এই হল ঠাকুরের নরেন্দ্র সাধনায় সিদ্ধি, বীজমন্ত্র যার জীবমন্ত্র। নরেন্দ্র সত্তায় রামকৃষ্ণের অনুক্রমণ যার উদ্দেশ্য জীবশিক্ষা। বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত হয়ে নরেন্দ্রাধারে ঠাকুরের লোকশিক্ষা।

'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি আর কুটিরই কি।'

□ বিবিদিষানন্দ □

'তুই সবাইকে আঁকড়ে থাকবি, সকলের আশ্রয় হবি। সকলের ভার তোর হাতে দিয়ে গেলুম। তারপর তোর যখন কাজ ফুরুবে, যখন একদিন বুঝতে পারবি তুই সত্যি কে, ফিরে যাবি স্বধামে।'

'তিনিই সব হয়েছেন। কেন? সবই আবার তিনি হবেন বলে। তুই এই হওয়ার বার্তাটি পৌছে দে ঘরে ঘরে। পৌছে দে জনে জনে।'

'এখানকার যা কিছু সব নজির স্বরূপ। আমি ষোলো টাং করে গেলাম যদি তোরা এক টাং করিস'। রোমা রেঁালা বলেছেন 'তাঁর একটি শক্ত সমর্থ শরীরের প্রয়োজন ছিল, তাঁর কর্মীদের জন্য একজন দেহরক্ষীরপ্রয়োজন ছিল, তাদেরকে চালানোর জন্য একটি মাথার দরকার ছিল, আরও প্রয়োজন ছিল বিশ্বপ্রেমিক একটি মহান হৃদয়ের। দিশাহারা, বিড়ম্বিত, একগুঁয়ে নরেন্দ্রকে তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে।'

তাঁর বার্তা দিকে দিকে, ঘরে, ঘরে, জনে-জনে, পৌছে দেবার কাজটি বিবেকানন্দ প্রাণ দিয়ে করেছিলেন, 'কুড়িটি বছর রামকৃষ্ণের সেবা করলাম—তা ভুলের ভিতর দিয়েই হোক্, বা সাফল্যের ভিতর দিয়েই হোক'—। 'গুরু মহারাজের ঋণ প্রাণ বার করে শুধে দিয়েছি। তাঁর আর দাবিদাওয়া নেই।'

কিন্তু সে আরও কিছু পরের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়ানে এক মহাশূন্যতার সৃষ্টি হল। কিন্তু তাঁর সন্তান-দলের মনে এই ধারনাও সঙ্গে সঙ্গেই বদ্ধমূল হল যে তাঁর প্রয়ানে তাঁর শেষ হয়নি, তাঁর শেষ হয় না।

গুরু মহারাজের অবর্তমানে শিষ্যরা তাঁকে যেন আরও বেশী করে পেলেন এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে প্রাণপাত করে ঈশ্বর দর্শনের অদম্য ইচ্ছা তাদের পেয়ে বসল।

কাশীপুরের বাগানবাড়ীর লিজ শেষ হতে তখনও সপ্তাহ দুয়েক বাকী। তারক, লাটু এবং গোপাল (বড়) আগেই গৃহত্যাগ করেছে। তারা এখন

সেখানেই থাকে। অন্যেরা রোজই সেখানে আসে, যোগধ্যান, ভক্তিগীতে আর ঠাকুরের কথা আলোচনা করে শান্তি পায়। ঠাকুরের জীবনের কথা, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যের কথা, তাঁর শিক্ষার কথা নরেন সকলকে বোঝায়, এমন করে বোঝায়, এমন ভাষায় বোঝায় যে সকলের গায়ে কাঁটা দেয়, উদ্দীপন হয়।

এই সদ্য গুরুহারা ছেলেদের অছি নরেন্দ্র, গুরুর আদেশে এদের সব ভার তার, তাই সব সময় সজাগ সতর্ক দৃষ্টি, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ পথভ্রষ্ট না হয়, কামিনীকাঞ্চন তাদের না টানে।

ঠাকুরকে একদিন দেখল নরেন—তিরোধানের সপ্তাহ খানেক পর, সন্ধ্যা অনুমান আটটা, নরেন আর হরিশ বাগানবাড়ীর পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছে ঠাকুরের কথা, হঠাৎ নরেন দেখল কাপড়ে সমস্ত দেহ ঢেকে কে যেন ফটকের দিক থেকে আসছে। কে ওখানে? যুঁই ফুলের ঝোপের কাছে এসে মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। আলো নিয়ে এসে সকলে মিলে অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু আর তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না।

ঠাকুরের সব ভস্মাস্থি একত্র করে একটা তামার কলসীতে রাখল শশী, কাশী-পুরের বাগানবাড়ীতে সে কলসীর পূজা হতে লাগল। গৃহী ভক্তরা কলসীতে করে ভস্মাস্থি মাটিতে পুঁতে ফেলতে চাইল কাঁকুড়গাছিতে রামবাবুর বাড়ীর আওতায়।

শশী, নিরঞ্জন রুখে দাঁড়াল, মধ্যস্থতা করল নরেন।

শশীই শেষে একদিন মাথায় করে কাঁকুড়গাছি নিয়ে গেল ঠাকুরের অস্থি। কিন্তু তার আগে বড় বড় অস্থিগুলি আলাদা করে রাখা হল, নরেনেই নির্দেশে যা আজও বেলুড়ে রাখা আছে। নরেনই মাথায় করে রেখে এসেছিল নীলাম্বর মুখার্জ্জীর বাগানবাড়ী থেকে নিয়ে গিয়ে। 'আজ আমি গুরুকে এখানে রাখলাম, তিনি চিরকাল এখানেই থাকবেন।' কথাকটি বলার সময় নরেন ঠাকুরের কথা মনে করে কেঁদেছিল ঠাকুর একদা বলেছিলেন 'যেখানেই আমাকে রাখবি, সেখানেই আনন্দে থাকব।'

অন্য অস্থি-কলসটি কাঁকুড়গাছিতেই সমাহিত হয়েছিল। সে মন্দিরের নাম হয়েছিল যোগোদ্যান।

কিন্তু সংসার ত্যাগ করে যারা সন্যাসব্রত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা

শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে কঠিন ত্যাগব্রতে দীক্ষা নিয়েছে, যাদের আর কোনও মতেই গৃহে ফেরানো যাবে না তারা তাহলে যাবে কোথায়? গৃহী ভক্তরা অনেকে পরামর্শ দিলেন—সাধারন সাধুর মত এই ভক্ত শিষ্যদের হাটে বাটে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া যায় না। এরা ঘরে ফিরে গিয়ে পাড়াশুনো আবার শুরু করলে এদেরও আখের দাঁড়াবে আর এদের বাড়ীর লোকেরাও নিশ্চিন্ত হবে।

আবার সেই সুরেন মিত্তির—ঠাকুরের জীবদ্দশায় মথুর মোহনের পরই যিনি তাঁর ব্যয়ভারের অগ্রভাগ এতদিন বহন করেছিলেন একদিন দর্শন পেলেন ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে অনুনয় করছে, ছেলেদের দুর্দশায় একটু হাত বাড়িয়ে দিতে।

সুরেন মিত্তির ছেলেদের কাছে গিয়ে বললেন—কাশীপুরের বাড়ীটার জন্য কিছু কিছু আমি দিতুম, তা একটা বাড়ী ভাড়া নিই, তোমরাও একসাথে জপধ্যান করতে পারবে, আর আমরা গৃহীরাও মাঝে মাঝে এসে প্রাণ জুড়াবো। নরেন আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

খুঁজে পেতে নরেন বরানগরে একটা বাড়ী ঠিক করে ফেলল।

"সম্ভবতঃ ১৮৮৫ সালের আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বরাহনগর মঠের প্রারম্ভ, এই সময় এইরূপ একটি স্থান নির্দিষ্ট হওয়াতে সকলে আসিয়া মিলিতে লাগিলেন এবং তারকনাথ (মহাপুরুষ) প্রধান হইয়া সকলকে দেখিতে লাগিলেন।

মঠের বাড়িটা অতি প্রাচীন, ভগ্ন, নীচেকার ঘরগুলি মাটিতে ডুবিয়া বসিয়া গিয়াছে; শৃগাল ও সর্পের আবাসস্থান। উপরে উঠিবার সিঁড়ির ধাপগুলি খানিকটা আছে, অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতলের দালানের মেঝের খোয়া দুই হাত আছে ত দুই হাত উঠিয়া গিয়াছে। দরজা জানালার তক্তাগুলির খানিকটা আছে, খানিকটা নাই; ছাতের বরগা পড়িয়া গিয়াছে, বাঁশ চিরিয়া ইঁটগুলি রাখা হইয়াছে। চতুর্দিকে জঙ্গল। ভূতের বাড়ি ত সত্যই ভূতের বাড়ী।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উত্তরদিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ হাতে যাইতে প্রথম একটি নাতিবৃহৎ গৃহ যেটিকে 'কালী বেদান্তীর বা কালী তপস্বীর' ঘর বলা হইত। তাহার পর দুই ধাপ উঠিয়া একটি ছোট দরজা এবং ভিতরে যাইবার পথ। আর একটু ঢুকিলে বাঁ দিকে ঠাকুরের ঘর এবং সম্মুখে একটি লম্বা দালান ও দালানের পশ্চিমে একটি বড় ঘর। বড় ঘরের ভিতর দিয়া যাইলে উত্তর-পশ্চিম

দিকে ছোট একটি ঘর, সেখানে জল থাকিত ও সকলে বসিয়া খাইত। তাহার পর উত্তর-পশ্চিম দিকে পায়খানা। আর ভোজন গৃহের পূর্ব্বদিকে একটি গৃহে রান্না হইত।

এইটি হইল বরাহনগরের মঠ।"[১৫]

এই বাড়ীর ভাড়া মাসিক দশ টাকা। পরামানিক ঘাটে মুন্সীদের এই ভূতুড়ে বাড়ীতে কৃচ্ছ্র-সাধনের আদ্যোপান্ত করে ছেড়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ-ভ্রাতৃত্বের শুরু এখানে, ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের জন্ম এখানে। রামকৃষ্ণের ভস্মাধারে এখানেই জন্ম নিয়েছিল নতুন নতুন ফিনিক্স পাখী, সন্ন্যাসী সন্তানদল।

আর এই কষ্টসাধ্য সাধন যে সম্ভব হয়েছিল তার সিংহভাগ কৃতিত্ব কিন্তু সেই নরেনের।

যে ছেলেরা গৃহে ফিরে গিয়েছিল তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, তাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তর্ক করে নরেন ওদের ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল বরাহনগরে।

এইসব সন্ন্যাসী যুবকেরা নরেনের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল স্বতঃসিদ্ধ ভাবে। শুধু রামকৃষ্ণ বলে গিয়েছেন বলে নয়। তার গানের টানে, তার ব্যক্তিত্বের প্রখরতায়, আধ্যাত্মিক গভীরতায়, বৈরাগ্যে, কষ্টসহিষ্ণুতায়, অগ্নিগর্ভ আলোচনায়, রামকৃষ্ণ স্মৃতি মন্থনে, অতি স্বাভাবিক ভাবেই সতীর্থদের ভালবাসা প্রায় শ্রদ্ধার পর্য্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। যোগ্য পাত্রেই গুরু-মহারাজ গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আর নরেনের চৌম্বক আকর্ষনের টান কাটিয়ে কেউই বিপথগামী হয়নি, একটি বারের জন্যও নয়।

স্বামী সদানন্দ পরে বলেছেন যে এ-সময় স্বামীজী উন্মাদের মত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতেন। এক মুহূর্তের জন্যও থামতেন না। অতিপ্রত্যুষে সকলকে জাগিয়ে নিয়ে পঠন পাঠন, জপ-ধ্যান, নাম-কীর্ত্তন মধ্যরাত্রির পরেও চালিয়ে যেতেন। বাইরের লোকে আসত যেত, পণ্ডিতেরা তর্ক করত। প্রতিবেশীরা অভিযোগ করত, স্বামীজী থামতেন না। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক,

১৫। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্র দত্ত
১ম খণ্ড, পৃঃ-৩৪, ৩৬

মীমাংসা, বেদান্ত, কান্ট, হেগেল, মিল, স্পেন্সার, সমাজবিদ্যা, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান সবই আলোচনা করতেন ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে।

যে কষ্ট নরেন এবং তার সতীর্থ সন্ন্যাসীরা এ সময় সহ্য করেছিল তা মানুষে সহ্য করতে পারে না।

"ভিক্ষার যে চাউল আসিত তাহা সিদ্ধ করা হইত। তৎপরে এক বস্ত্র-খণ্ডের উপর তৎসমুদয় ঢালিয়া তাহার চতুর্দিকে সকলে মিলিয়া বসিতেন এবং লবণ ও লঙ্কার ঝোল করিয়া তাহাই দিয়া ভোজন সমাপ্ত করিতেন, কখনও বা তেলকুচা পত্রের ঝোল হইত। জলপানের জন্য একটিমাত্র ঘটি ছিল। একটি বাটিতে নুন লঙ্কার ঝোল থাকিত; সকলেই একগ্রাস করিয়া একবার ভাত মুখে লইতেন, ও একবার ঐ ঝোল মুখে দিতেন; জিহ্বায় অত্যন্ত ঝাল ঝাল লাগিত।

দুইখানি বা তিনখানি বহির্বাস ছিল। আর সকলের নিজের নিজের কপ্‌নি মাত্র। যে রাস্তায় যাইত সে বর্হিবাস পরিয়া বাহির হইত, বাড়িতে থাকিলে তাহা পরিত না। অবশেষে কপ্‌নিও ছিঁড়িয়া গেল।"[১৬]

দিনরাত্রিতে ভেদাভেদ ছিল না, ঈশ্বরদর্শনের জন্য সকলেই ছিল উন্মাদ, আর এ সময় সকল শিষ্যই গুরুমহারাজকে যেন নিয়ত প্রত্যক্ষ করতেন, তাঁর অপূর্ব্ব বাণী শুনতে পেতেন।

যতই কষ্ট অসহ্য হত নরেন বলত, "তিনি (পরমহংসদেব) ষোল আনা কঠোর করেছিলেন, আমরা কি তার এক আনাও করতে পারব না?"

স্বামীজী নিজেই পরে বলেছেন, সে সময়কার কথা বলে বোঝান যায় না। মহেন্দ্র দত্ত বলেছেন "এই বরাহনগর মঠের প্রত্যেক বস্তুরই স্মৃতি অতি পবিত্র অতি মধুর। রামকৃষ্ণ মিশন যে শক্তি এখন প্রকাশ করিতেছেন তাহা কাশীপুর উদ্যান এবং বরাহনগর মঠেই সঞ্চিত হইয়াছিল।"

দক্ষিণেশ্বরের প্রাণপুরুষ রামকৃষ্ণ, বরাহনগরের প্রাণপুরুষও রামকৃষ্ণ তবে তা সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে।

বরাহনগর মঠে আসার কয়েক মাস পরে বাবুরামের মাতার আমন্ত্রণে একবার সকলে মিলে আঁটপুর গিয়েছিলেন। এখানেই একরাত্রিতে বিশাল ধুনি-জ্বালিয়ে

১৬ : শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্র দত্ত ১ম খণ্ড পৃঃ-৩৬

তার সামনে সকলে অধ্যাত্মভাবে বিভোর হয়েছিলেন। ধ্যান ভাঙ্গলে নরেন ভাবাবেশে প্রভু খ্রীষ্টের কথা বলতে শুরু করলেন। রহস্যময় জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে দেহাবসান, এবং পুনরুত্থান। সতীর্থদের মনে হয়েছিল সেন্টপল-এর বাণী শুনছেন। রামকৃষ্ণের বাণীপ্রচারক, ঠাকুরের সেন্টপল সেদিন উপস্থিত সকলের মনেই বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাসধর্মের প্রতি অদম্য অনুরাগ এনে দিয়েছিল।

বরাহনগর মঠেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল পবিত্র বিরজা-হোম, যে অনুষ্ঠানে সকলে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য এবং কৃচ্ছ্রসাধনের সংকল্প করেছিল, প্রাণ উৎসর্গ করেছিল ঈশপ্রেমে।

সন্ন্যাসীরা সকলেই নূতন নাম গ্রহণ করেছিল নরেন্দ্র কিন্তু তখনও কোনও স্থায়ী নামান্তর গ্রহণ করেনি।

সকলের মনেই এই সময় একটা দ্বন্দ্ব প্রগাঢ়ভাবে অনুভূত হয়েছিল। একদিকে মঠ এবং মিশনের প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে নির্জনে গিয়ে একাকী তপস্যা করার আকর্ষণ, তীর্থভ্রমণের, পরিব্রজ্যার হাতছানি।

ঠাকুরের দেহাবসানের পরেই লাটু, যোগীন এবং তারক শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনতীর্থে চলে গিয়েছিল। সারদা একদিন একটি ছোট চিঠি লিখে পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করেছিল। গঙ্গাধর হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতে তীর্থযাত্রা করেছিল। কালী, শরৎ এবং বাবুরাম পুরী গিয়েছিল, রাখাল মাঝে মাঝেই নর্মদাতীরে কোনও নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যান করার কথা বলত। বরাহনগর মঠের পবিত্র পারিপার্শ্বিকেও সন্ন্যাসীরা হাঁপিয়ে উঠছিলেন। একমাত্র শশী মঠ ছেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তাই করতেন না। গুরুমহারাজের পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত মঠেই তিনি থাকতে চাইতেন।

নরেনও অস্থির হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। তার মনে হচ্ছিল গুরুভাইদের গুরুদায়িত্বের গুরুভার সোনার শৃঙ্খল, ঈশ্বরোপলব্ধির পথে অন্তরায়।

তাই নরেনও আত্মসন্ধানে একাকী বেরিয়ে পড়তে চাইল। গুরুভাইরা একে একে সকলেই বেরিয়ে পড়েছে রামকৃষ্ণানন্দ (শশী) ছাড়া।

প্রথম প্রথম নরেন বেরিয়ে পড়ত দু'চারদিনের জন্য আবার ফিরে আসত, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।

বৈদ্যনাথধাম আর শিমূলতলায় কয়েকটি ঝটিকাসফর। আর একবার গুরু-

ভাইদের অনুরোধে বিশ্রামের জন্য আঁটপুর যাওয়া ছাড়া ১৮৮৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নরেন মোটামুটি বরাহনগর মঠেই ছিল।

কিন্তু পরিব্রাজক সাধুর জীবন, পথের টান, আত্মোপলব্ধির প্রবল বাসনা, মানুষকে তার নিজের পটভূমিকায় নিরীক্ষণ করার উদগ্র ইচ্ছা, জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে নরনারায়ণকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা জয়ী হয়েছিল মঠ মিশন গুরুভাইদের তদারকির দায়িত্বের সঙ্গে। আর তাদেরও তো নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

যা হোক নরেন্দ্রনাথের পরিব্রাজক জীবন এবার শুরু হল। যদিও তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিশেষ জানা যায় না কারণ তিনি ভ্রমণপথে যথার্থ একাকী হয়ে যেতেই ভালবাসতেন। তবু কিছুদিন তাঁর সঙ্গী দু'একজন গুরুভাই ছিলেন আর তাঁদের কাছ থেকে কিছু কিছু তত্ত্ব এবং তথ্য জানা যায়। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পরিব্রাজক জীবনের, বিশেষ করে ১৮৯০ পর্য্যন্ত তো অনেকটাই সঙ্গে ছিলেন অখণ্ডানন্দ।

প্রথম যাত্রা বারানসী, সঙ্গে প্রেমানন্দ এবং ফকির বাবু। সপ্তাহ খানেক ছিলেন বুদ্ধদেব, শঙ্করের পদ ধূলিধন্য এই মহাতীর্থে। ছিলেন দ্বারকাদাসের আশ্রমে। আলাপ করেছিলেন ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে যাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণও বারাণসীতে আলাপ করেছিলেন। আলাপ করেছিলেন স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গেও যিনি বিশ্বাস করেননি যে কোনও মানুষ সত্যিই কামিনীকাঞ্চন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে পারে।

ফিরে এলেন বরাহনগরে কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়।

আবার বেরিয়ে পড়লেন। এবারও প্রথম বারাণসী। আলাপ হল বাবু প্রমদাদাস মিত্রের সঙ্গে। প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ। এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী এবং গভীর ফলপ্রসূ হয়েছিল।

এরপর অযোধ্যা। এখানে সাধুদের রামায়ণগানের মধ্যে রাজর্ষি রামের স্মৃতিবিজড়িত দৃশ্যাবলী দেখে আনন্দ পেয়েছিলেন।

সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ। অযোধ্যার নবাবদের প্রাসাদগুলি, মসজিদ এবং উদ্যানাদি দেখে আনন্দ পেয়েছিলেন।

তারপর মুঘল মহিমামণ্ডিত তাজমহলনগরী আগ্রা। তাজ দেখে স্বামীজী (শুধু স্বামীজী কারণ বিশেষ কোন্ নামে কোথায় পরিভ্রমণ করেছিলেন তা এই

পর্য্যায়ে বিশেষভাবে কোথাও উল্লেখ নেই) বলেছিলেন "এই আশ্চর্য্য প্রাসাদের প্রতি বর্গইঞ্চি একটা পুরো দিন ধরে পরীক্ষা করার মত, আর একে সত্যি সত্যিই ভালভাবে দেখতে হলে অন্ততঃ ছ'মাস লাগার কথা" আগ্রার দুর্গ, প্রাসাদ মসজিদের মাঝে হাঁটতে হাঁটতে পুরো মুসলমান যুগটাই স্বামীজীর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

আগ্রা থেকে বৃন্দাবন। ১৮৮৮র গোড়ায়। শেষ ত্রিশ মাইল গিয়েছিলেন পদব্রজে। সন্ন্যাসীর দণ্ড এবং কমণ্ডলু আর গুটিদুই বই ছাড়া সঙ্গে কিছু ছিল না। বৃন্দাবনের পথে দেখা পেয়েছিলেন এক ভাঙ্গীর, তার এঁঠো ছিলিম থেকে তামাক খেয়ে নিজের কাছে নিজে প্রমাণ করেছিলেন সন্ন্যাসীর কোনও ভেদ থাকতে নেই। সর্বজীবে সমদর্শন, বাছ বিচারের উর্দ্ধে, সন্ন্যাসী। সহজ নয়, কিন্তু সন্ন্যাসীকে ভাবতে হবে, সবাই অমৃতের সন্তান।

বৃন্দাবনে 'কালাবাবুর কুঞ্জে' বলরাম বসুর পূর্ব পুরুষদের গৃহে স্বামীজী উঠলেন। গোবর্দ্ধন পর্বতের পরিক্রমা করার সময় প্রতিজ্ঞা করলেন ভোজ্য তাঁর কাছে না এলে তিনি গ্রহণ করবেন না। দ্বিপ্রহরে ক্ষুৎক্লান্ত স্বামীজী প্রবল বর্ষণের মধ্যে শুনতে পেলেন ভোজ্য নিয়ে কেউ তাঁর পিছু ধাওয়া করছে। মায়ের দয়া পরখ করার জন্য স্বামীজী তাকে এড়িয়ে ছুটলেন। লোকটি পিছু পিছু ধাওয়া করল। খাদ্যসামগ্রী পেয়ে স্বামীজীর চোখে জল এসেছিল। ভক্তকে ভগবান রাখে।

গোবর্দ্ধন থেকে রাধাকুণ্ড। বৈষ্ণবতীর্থ। এখানে অবগাহন করার সময় স্বামীজীর কৌপিন এক বানর নিয়ে গেল। কিন্তু আবার অদ্ভুতভাবে সেই একই স্থানে ফিরে পেলেন। এর কোনওটাই ভেল্কী নয়; শুধু পুনর্মূল্যায়ন—ভগবান ভক্তকে কখনও পরিত্যাগ করেন না।

এরপর নরেনকে দেখি 'হাথরাস' রেল স্টেশনে। স্টেশন মাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত। বাঙ্গালী, কিন্তু জৌনপুরের মানুষ, মাতৃভাষার চেয়েও বেশী পারদর্শী হিন্দি এবং উর্দুতে। এই প্রবাসী বাঙ্গালী বাবুই ভবিষ্যতের স্বামী সদানন্দ। কর্মনাশ করে একদণ্ডে হাথরাস থেকেই নরেনের পিছু নিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত—

"যাহা হউক নরেন্দ্রনাথ হাথরাস স্টেশনে গাড়ী থামিলে নামিয়া পড়িলেন। কিছু পরে যাত্রীরা স্টেশন ত্যাগ করিয়া যে যার গন্তব্য স্থলে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ একখানি বেঞ্চের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, অতিশয় বিষণ্ণ, চোখে যেন একটু একটু জল আসিতেছে—বেহুঁশ, বাহিরের কোনও দিকেই যেন মন নাই। একটা কি গভীর চিন্তায় যেন মগ্ন। সেই সময় নরেন্দ্রনাথের মানসিক কষ্ট অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্টেশনের একটি কর্মচারী আসিয়া বলিল, 'ক্যা বাবাজী! ইঁহা পর কেঁও বেঠা হায়? যাওগে নেহী?' নরেন্দ্রনাথ উত্তরে বলিলেন, "হাঁ মহারাজ জায়েঙ্গে। লেকিন কাঁহা জায়েঙ্গে, নেহী জানতা।"

এই বলিয়া আবার যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইতে লাগিলেন। উপস্থিত কর্মচারীটি আবার বলিল, "বাবাজী, তামাকু পিওগে?" নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "হাঁ মহারাজ! পিলাও তো পিয়েঙ্গে।" কর্মচারীটি জৌনপুরী বাঙ্গালী, তাঁহার ভাষাই হিন্দুস্থানী হইয়াছিল। হিন্দুস্থানী স্বাভাবিক হিন্দী উচ্চারণ ও বাঙ্গালীর শেখা হিন্দী উচ্চারণ অনেক তফাৎ। এই নিমিত্ত কর্মচারীটি বলিল, "আপনি কি বাঙ্গালী?" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ আমি বাঙ্গালী।" কর্মচারীটি বলিল "তবে আর কোথায় যাবেন, আমি বাসায় একা থাকি, আমার বাসায় চলুন"।

স্টেশনের কাছে এই কর্মচারী শরৎচন্দ্র গুপ্তের বাসা। তিনি ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া দিয়া স্নান করাইয়া দিলেন এবং উপস্থিত কিছু খাইতে দিলেন। নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন এই যুবকটি স্টেশনের কর্মচারী;—পশ্চিমে বাঙ্গালী। শরীর খুব হৃষ্টপুষ্ট, বিবাহ করে নাই; প্রাণটা বড় সরল। নরেন্দ্রনাথ আপনা আপনি গান করিতে লাগিলেন, "সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম তুমি কেন অকারণ" ইত্যাদি।

তাঁহার মুখের গানটি শুনিয়া উক্ত কর্মচারীর যেন মুহূর্তে সব ভাব বদলে গেল—তাঁহার আর চাকুরী করা বা বাড়ী ঘর দোরের কথা যেন চিরকালের জন্য একেবারে মন থেকে দূর হয়ে গেল। বাবা, মা, ভাই, বোন, সকলি তার ছিল; কিন্তু সে তখন যেন অন্য প্রকার হইয়া উঠিল। সংসারের কোনও বিষয়ই যেন তার আর উপাদেয় বোধ হইল না।

—সংসারের মায়া মমতা বিস্মৃত হইয়া, গুপ্ত নরেন্দ্রনাথকে গিয়া সরল প্রাণে বলিল, "আমার কি হবে? আমায় তুমি সঙ্গে করে নিয়ে চল।"

—তারপর গুপ্ত স্থির করলে—কাজ কর্ম ছেড়ে সন্যাস নিতে হবে। স্টেশন

অফিস থেকে নিজের মাহিনা ও যে টাকা জমা ছিল তাহা বুঝিয়া লইল। কাপড় গেরুয়া রঙ্গে ছুবাইয়া লইল এবং হরিদ্বার, হৃষীকেশে যাওয়া হইবে, দুজনের মধ্যে এইরূপ স্থির হইল।"[১৭]

বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে হাথরাসের বাঙ্গালীকুল যুবা সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে এসে যার পরনাই আনন্দলাভ করেছে। শরত, তার বন্ধু নটকৃষ্ণ ও ব্রজেন বাবু যিনি কাছেই থাকতেন অগ্রণী হয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।

যাবার সময় নরেন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল কিন্তু শরৎ গুপ্তকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারল না। তাকে দীক্ষা দিতে হল, সঙ্গে নিতে হল।

গুরুশিষ্যে এরপর হৃষীকেশ যাত্রা। সন্ন্যাস-জীবনের কঠিন কায়ক্লেশে অনভ্যস্ত শরৎ ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে পথে টলে পড়লে স্বামীজী তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, সহিসের মত তার ঘোড়া টেনে পাহাড়ী ঝর্ণা পার করেছিলেন, এমন কি তার জুতো পর্য্যন্ত বয়েছিলেন। "আরে তা না হলে কি স্বামীজী আমার গুরু হতে পারে? অম্লানবদনে আমার পরা জুতো মাথায় করে নিয়ে চললেন·· ··একেই বলে স্বামীজীর অকপট ভালবাসা। আমি জন্মেছি স্বামীজীর সেবা করবার জন্য। আমি আর কিছু জগতে জানি না।"

হৃষীকেশে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয় দেখে, আর পবিত্র গঙ্গার কুলুতান শুনে গুরুশিষ্য উভয়েই মুগ্ধ। প্রবল ইচ্ছা কেদার বদ্রী যাওয়ার, কিন্তু শিষ্য এবং বিধি-বাদ সাধলেন। শরৎ এ সময় এমন অসুস্থ হয়ে হয়ে পড়লেন যে তাকে তৎক্ষণাৎ হাথরাস ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও গত্যন্তর রইল না।

অগত্যা হাথরাস প্রত্যাবর্ত্তন। কিন্তু এখানে গুরু পড়লেন প্রকট ম্যালেরিয়া জ্বরের কবলে।

বরাহনগর মঠ থেকে গুরুভাইরা খবর পেয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়লেন। যাতে তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন, তাঁরা খবর পাঠালেন যে স্বামীজীর উপস্থিতি ছাড়া মঠ রাখা দায়। শুনে স্বামীজী ফিরে যাওয়া স্থির করলেন।

১৭। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী— মহেন্দ্র দত্ত
১ম খণ্ড পৃঃ-৫৭

শরৎকে বলে গেলেন সুস্থ হয়ে উঠলেই যেন সে বরাহনগর চলে আসে। স্বামীজী ফিরলেন ১৮৮৮খ্রীঃ শেষাশেষি। সন্ন্যাসীরা অনেকেই প্রব্রজ্যায় বেরিয়েছেন। গৃহী ভক্তরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল নরেনের প্রত্যাবর্ত্তনে।

১৮৮৯ খ্রীঃ গ্রীষ্মকালে একবার শিমূলতলা যাওয়া ছাড়া স্বামীজী বরাহনগরেই ছিলেন পুরো একটি বছর। আবার জপ, ধ্যান, পঠন, পাঠন, প্রার্থনাগীতি কৃচ্ছ্রসাধন।

বিশ্বে, বিবেক, ভবিষ্যতে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তার অধিকাংশই বর্ষিত হয়েছিল, এই সময় বরাহনগরে গুরুভাইদের উদ্দীপনের জন্য।

কিন্তু কলকাতায় থাকার অন্য যন্ত্রণা ছিল, "মা ভাই বোনেদের দুঃখদারিদ্র নিজের চোখে দেখতে হত। রজোগুণের তাড়নায়, আত্মাভিমানে মাঝে মাঝে মনে হত ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

প্রমদাবাবুকে লিখলেন "আশীর্বাদ করুন আর কয়দিন কলকাতার প্রয়োজন ফুরোলে এই শহরকে যেন চিরতরে বিদায় জানাতে পারি।"

১৮৮৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসের শেষে বৈদ্যনাথধামের উদ্দেশ্যে আবার বেড়িয়ে পড়লেন।

সেখান থেকে কাশীধামের জন্য মন উচাটন হল, "বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা আমার ভাগ্যে কি লিখেছেন দেখি। হয় আমার আদর্শ উপলব্ধি করব না হয় এ জীবন বিসর্জ্জন দেব। কাশীর দেবতা, দয়া কর।" কিন্তু বিধি বাম।

যোগানন্দ বসন্তরোগাক্রান্ত। এলাহাবাদে। স্বামীজী ছুটলেন। সেবা শুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তুললেন।

এলাহাবাদের বাঙ্গালীসমাজ মুগ্ধ হয়েছিল এই সন্ন্যাসীর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আর অটুট চরিত্রবলে। এখানে এক মুসলমান সন্ন্যাসীর দেখা পেয়েছিলেন, "যাঁর মুখের প্রতিটি বলিরেখা পরমহংসের পরিচয় দিচ্ছিল।"

এখানেই স্বামীজী শুনলেন গাজীপুরের বিখ্যাত পওহারী বাবার কথা।

১৮৯০ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে স্বামীজী গাজীপুর চললেন।

মহেন্দ্র দত্ত বলছেন, "নরেন্দ্রনাথ কয়বার গাজীপুরে গিয়াছিলেন, বর্তমান লেখক তাহা বিশেষ পরিজ্ঞাত নন; সম্ভবত দুই বা তিনবার গিয়াছিলেন। তখন গাজীপুরে শ্রীশচন্দ্র বসুর বাড়ী বা গগনচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে অনেকেই গিয়া থাকিতেন। শ্রীশচন্দ্র বসু তখন গাজীপুরে মুন্সেফ ছিলেন। গাজীপুর

থেকে নরেন্দ্রনাথ গোবিন্দবাবুকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল, "গোবিন্দ, আমি গাজীপুরে আসিয়াছি, ও পওহারী বাবার সাথে দেখা করিতে যাইব। আশা করি তাঁহার নিকট কিছু পাইব।"

কে এই পওহারী বাবা? —বারানসীর কাছে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। ছোটবেলা কাটে গাজীপুরে। কাকা ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারী, তাঁর কাছেই ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা। কাথিয়াবাড়ের কাছে গিরনার পর্ব্বতে যোগাসিদ্ধিলাভের পর বারানসী ফিরে আসেন এবং গঙ্গাতীরে গুহার মধ্যে এক সন্ন্যাসী থাকতেন তাঁর কাছে অদ্বৈত বেদান্ত দীক্ষা লাভ করেন। বহু বছর দীর্ঘ পরিব্রজ্যার পর গাজীপুরে এসে তাঁর গুরুর মতই একটি গুহায় থাকতেন। দিবারাত্র ধ্যান করতেন। আহার প্রায় কিছুই ছিল না। তাই লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'পওহারী বাবা' অথবা 'বায়ুভূক সন্ন্যাসী'।

"গাজীপুর থেকে গঙ্গার কিনারায় কিনারায় দুইখানি গ্রাম পার হইয়া যাইলে পওহারী বাবার আশ্রম। দূরত্ব বোধ হয় নয় বা দশ মাইল হইবে। গঙ্গার দিকে একটি বাঁধান-ঘাট ছিল, ঘাটের সন্নিকটে একটি গোড়া বাঁধান অশ্বত্থ গাছ। উঠানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সম্মুখে একখানি বড় চালাঘর এবং বাঁ দিকে লম্বা পাঁচিল ঘেরা একটি স্থান। স্থানটি অতি নির্জন ও সুরম্য এবং তথায় একটি পঞ্চবটি আছে। চালাঘরটিতে লম্বা একটি মেটে দাওয়া আছে এবং সম্মুখে দুইটি প্রকোষ্ঠ ও দুইটি দরজার মাথায় মালার মত চৌকো চৌকো সাতরঙের ন্যাকড়ার টুকরা ঝুলান ছিল। বাঁ দিকের অভ্যন্তরে একটি উঠান। দরজাটি সবসময়ে বন্ধ থাকিত এবং কপাটের উপরিভাগে চিঠি ফেলবার মত সামান্য একটি কাটা গর্ত্ত ছিল। মধ্যের ঘরটির মাঝখানে একটি দরজা ছিল তাহা দিয়া বামপার্শ্বেয় উঠানটিতে যাওয়া যাইত। একটি ছোট গরাদবিহীন জানালা ছিল তাহা সর্বদাই বন্ধ থাকিত, সেই গবাক্ষের কপাট খুলিয়া পওহারী বাবার ভোজ্যদ্রব্য দেওয়া হইত। ভিতরের উঠানে একটি পাতকুয়া ছিল, কারণ ঘটি বা লোটাতে দড়ি বেঁধে জল তোলবার আওয়াজ পাওয়া যাইত। তা'ছাড়া উঠানে গুফা ছিল, পওহারী বাবা নাকি সেখানে বাস করিতেন। সাধারণ লোকের সহিত তিনি কখনও কথা কহেন নাই এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন বড় একটা হইত না। যাহাকে তিনি কৃপা করিতেন তাহারই সহিত দরজার পূর্বোক্ত ছিদ্র দিয়া অল্পক্ষণ কথা কহিতেন।

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের সহিত পওহারী বাবার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা কেহই বিশেষ জানেন না। তবে লণ্ডনে বক্তৃতাকালে পওহারী বাবার প্রসঙ্গ উঠায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "পওহারী বাবার মতন এমন উচ্চস্তরের লোক অতি অল্পই পাওয়া যায়, তাঁহার উচ্চাবস্থার কথা অতি অল্প বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।"

কারণ পওহারী বাবা নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, যে, "এসব যে ধর্ম্মকর্ম্ম কচ্চ। এ সবই বাজে জিনিষ, আসল এখানে নেই। যেখানে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এক হইয়াছে সেইটি জানিবে যে, ধর্ম্মজীবনের প্রথম বনেদ। তারপর থেকে মনকে ধীরে ধীরে উপরে তুলিতে হইবে। অর্থাৎ বিপরীত ভাব যখন এক হইবে বা দ্বন্দাতীত অবস্থায় পৌছিবে সেইটাই চরম অবস্থা মনে করিও না, সেইটি প্রথম সোপান।"[১৮]

পওহারী বাবা সম্বন্ধে বেশী কিছু স্বামীজী নিজে কখনও বলে যান নি। কিন্তু এই সাধু তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বিপরীতমুখী দুটি প্রবল আকাঙ্খার দ্বন্দ যা বরানগরে তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল, গাজীপুরেও সেই দোটানায় মনকে অস্থির করে তুলেছিল। নির্বিকল্প সমাধিতে সদারুঢ় হয়ে থাকার প্রবল আকাঙ্খা আর 'রামকৃষ্ণের কাজ' লোকশিক্ষা —এই দুই টান।

মন যখন এমনি অশান্ত তখনই দেখা পেয়েছিলেন পওহারী বাবার। সন্ধান চেয়েছিলেন কর্মকাণ্ডে থেকেও মনকে ব্রহ্মাবিষ্ট রাখা যায় কিনা।

নরেন্দ্রনাথ পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেবার, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হল না।

গুরুদেব একদিন দেখা দিলেন, শুধু চোখে চোখে চেয়ে রইলেন। একবার নয় দু'বার।

পরে অবশ্য ঘোর কেটেছিল। "বোধ হয় ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই।"

জন্ম হইতেই নরেন্দ্র ঠাকুরের জন্য বলিপ্রদত্ত। রামকৃষ্ণের কাজে উৎসর্গীকৃত। চলার পথে যখনই দ্বিধা এসেছে, ব্যক্তিগত সমাধিতে তুরীয়ানন্দে বিলীন হয়ে,

১৮। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্র দত্ত
১ম খণ্ড পৃঃ-১৮৯

সে কাজ, ভোলার কথা ভেবেছে, তখনই, হয় তিনি নিজে এসে ভুল ভাঙ্গিয়েছেন, আর না হয় একটা কিছু ঘটেছে। সিদ্ধান্ত বদল করতে হয়েছে।

গাজীপুরে ভুল ভাঙ্গার পর প্রমদাবাবুকে লিখেছিলেন, "আর কোনও মিঞার কাছে যাইব না"

আর, এই মিঞা যে যেতে দেবেও না, অন্য কিছু করতেও দেবে না; তাও স্বামীজী জানতেন, "দেখ জি, সি, আমার ভগবান লাভ করা হল না। আমি সব ত্যাগ করেছি, আমি সব ভুলেছি, কিন্তু ঐ দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনটাকে ভুলতে পারি না। ওই যত আমার কণ্টক হয়েছে।"

প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গুরুভাইদের না জানিয়ে গাজীপুর থেকে কিছু দূরে এক গ্রামে গিয়ে ধ্যান শুরু করলেন।

কিন্তু অভেদানন্দ ম্যালেরিয়ার জ্বরে ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন হৃষীকেশে। তাঁকে বারাণসী নিয়ে আসা হল।

স্বামীজীও তাড়াতাড়ি বারাণসী চলে এলেন। প্রমদাবাবুর তত্ত্বাবধানে অভেদানন্দের চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা করার পর এই পূণ্যতীর্থে তপস্যা শুরু করলেন।

এখানেই তিনি দুঃসংবাদটি পান—বলরাম ঘোষ আর ইহজগতে নেই। শোকে এত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন যে সন্ন্যাসীর এই শোক, বেদান্তীর এই বিহ্বল অবস্থা দেখে প্রমদাবাবু অবাক হয়েছিলেন।

নরেনের উত্তর, "আপনারা কি মনে করেন মানুষ সন্ন্যাসী হলে তার হৃদয়বত্তা কিছু থাকে না?"

শোকসন্তপ্ত পরিবারটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার ইচ্ছায় এবং মাঠের টানে নরেন আবার কলকাতায় ফিরল।

সুরেশ মিত্তিরের দেহাবসনের পর মঠের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। খাওয়া দাওয়ার অভাব প্রচণ্ড। গুরুভাইদের অনুপ্রাণিত করার জন্য নরেনের এই সময়ে প্রয়োজন ছিল খুব। ঠাকুরের স্মৃতিচারণ করে, জপে ধ্যানে নরেন এই সময় যথার্থ নেতৃত্ব দিয়েছিল গুরুভাইদের।

বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিরক্ষার্থে কিছু করা দরকার এই চিন্তা নরেনকে এই সময় খুবই ভাবিয়ে তুলেছিল। এক পত্রে প্রমদাবাবুকে তিনি এ কথা লিখেওছিলেন বিস্তারিতভাবে।

নতুন করে অস্থিরতা আবার পেয়ে বসল নরেনকে। পথ আবার ডাক দিল, দেশ ঘুরে দেশবাসীকে জানার ইচ্ছা আবার চাড়া দিয়ে উঠল।

মাত্র দু'মাস বরনগরে থাকার পর ১৮৯০ খ্রীঃ জুলাই মাসে আবার স্বামীজী বেরিয়ে পড়লেন।

"গিরিশচন্দ্র ঘোষ মঠের খরচ চালাইতেছেন আপাততঃ ভালয় ভালয় দিন গুজরানো হইয়া যাইতেছে। আমি শীঘ্রই (অর্থাৎ ভাড়ার টাকাটা যোগাড় হইলেই) আলমোড়া যাইবার সংকল্প করিয়াছি। সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোনও এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল ধ্যানে মগ্ন হইবার ইচ্ছা। গঙ্গাধর আমার সঙ্গে যাইতেছে॥ বলিতে কি আমি শুধু এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাহাকে কাশ্মীর হইতে নামাইয়া আনিয়াছি।...এক দৌড়ে আমি হিমালয়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি।"[১৯]

গুরুভাইদের বলে গেলেন—"যতদিন না এমন শক্তি পাচ্ছি যে স্পর্শমাত্র মানুষকে উদ্দীপিত করতে পারব ততদিন ফিরছি না।"

'ঘুসুরী' গ্রামে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে বললেন, "মা যতদিন না সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান আহরণ করতে পারছি ততদিন ফিরব না।"

এবারের যাত্রার একটি বিশেষত্ব রয়েছে। বাধাবন্ধহারা, পিছটান ছাড়া; সম্পূর্ণ বৈরাগী, ভবঘুরের জীবন চেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন নিজেকে গার্হস্থ্য জীবনের সমস্তরকম সংশ্রব থেকে। 'গণ্ডারের মত' একাকী ভ্রমণ করতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছিলেন একবার অন্ততঃ নির্জনে তাঁর ধ্যান করতে হয়। নরেন্দ্রও চেয়েছিলেন নিবিষ্ট মনে নিশ্চিন্তে নির্জনে ধ্যানারূঢ় হতে। অনেকবারই এ সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। এবারও পারেন নি। 'সমাধিগৃহের চাবিকাঠি' শিষ্যের এক্তিয়ারে ছিল না। গুরু সেটি নিয়ে রেখেছিলেন।

তবু এবারের প্রব্রজ্যা, এবারের ভারতদর্শন, ভারত পথিক, বিবেকানন্দকে, ভারতের স্বয়ম্ভু প্রবক্তা বিবেকানন্দকে সৃষ্টি করেছিল। তাই এর গুরুত্ব, আলাদা; অপরিসীম। এমন কি গুরুভাইদের সংশ্রব পর্য্যন্ত এবারের পরিব্রজ্যায় তাঁর অসহ্য মনে হয়েছিল।

আলো, হাওয়া, জল ছাড়া যেমন জীবনের স্ফুরণ হয় না, তেমনি বিশেষ

১৯। পত্রাবলী পত্র-৫৩

ধরনের জীবনকে সম্ভব করে বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক। আর সে পারিপার্শ্বিক নরেনের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল না। ভবিষ্যতের বিবেকানন্দ নিজেই নিজের প্রয়োজনাদি বুঝে নিয়েছিলেন। সঠিক রূপটি চিনে নিয়েছিলেন 'মূর্খ ভারতবাসীর চণ্ডাল ভারতবাসীর'। স্বামী বিবেকানন্দ সেই অঙ্গুলিগণ্য কতিপয় ভারতীয় পুরুষের একজন যিনি স্বয়ংক্রিয়, স্বয়ংসিদ্ধ।

কিন্তু লোকশিক্ষা দেওয়ার আগে লোকশিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন এই সন্ন্যাসী-পুরুষেরও ছিল। তাই এবার শুধু 'দানভিক্ষা' নয় 'জ্ঞানভিক্ষা' করার জন্যও 'মাধুকরী'তে বেরিয়ে পড়লেন।

অখণ্ডানন্দকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে গেলেন ভাগলপুর। এখানে মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে তাঁরা কিছুদিন ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম। স্বামীজীর সান্নিধ্য তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

এরপর বৈদ্যনাথ। এখানে ব্রাহ্মধর্মের প্রবক্তা বাবু রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে আলাপ হয়।

তারপর আবার বারাণসী। প্রমদাবাবুকে স্বামীজী বলেছিলেন, 'এবার যখন ফিরব, সমাজের ওপর কামানের মত এসে পড়ব, আর, সমাজ আমাকে কুকুরের মত অনুসরণ করবে।

তারপর জানকীবর শরণের আশ্রমে অযোধ্যায়। এঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে স্বামীজী আনন্দ পেয়েছিলেন, বলেছিলেন,' একজন সত্যিকারের ধার্মিক লোক দেখলাম।'

এবার স্বামীজী গুরুভাইকে নিয়ে নৈনিতালে রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের অতিথি হয়ে উঠলেন।

তারপর বদরিকাশ্রমের পথে আলমোড়া। কপর্দকশূন্য অবস্থায়, পদব্রজে চলতে চলতে একটি বটগাছের নীচে স্বামীজী ধ্যানে বসেন। ধ্যানশেষে অখণ্ডানন্দকে বলেন, 'গঙ্গাধর, জীবনের একটি জটিল সমস্যার সমাধান আজ এখানে পেয়ে গেলাম।'

এই বটবৃক্ষতলে স্বামীজী ধ্যানদৃষ্টিতে প্রতক্ষ্য করেছিলেন পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন, শিব এবং কালীর আলিঙ্গন। প্রত্যক্ষ করেছিলেন macrocosm এবং microcosm এক এবং অভিন্ন।

এক-কে স্বামীজী ধ্যানে পেলেন ব্রহ্মরূপে। আবার সেই এক-কেই বহু

বিত্তত রূপে পাওয়ার জন্য হলেন অল্পনিদ্র পথচারী পরিব্রাজক।

আলমোড়ায় পৌছে অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে নিয়ে গেলেন অম্বা-দত্তের বাগানে। লালা বদ্রী-শার অকপট আতিথ্যে এখানে সেরেস্তাদার শ্রীকৃষ্ণ যোশীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা করে আনন্দ লাভ করেছিলেন।

কিন্তু এখানেই একটি টেলিগ্রামে স্বামীজী তাঁর এক ভগিনীর আত্মহত্যার মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলেন।

শোকাহত সন্ন্যাসী স্থির করলেন আরও নির্জনে যাওয়া দরকার।

সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ এবং বৈকুণ্ঠ-কে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন গাড়োয়ালের পথে। অসুস্থ অখণ্ডানন্দকে নিয়ে পৌছোলেন কর্ণপ্রয়াগ। কেদারনাথ-বদরীকাশ্রম যাওয়া হয়ে উঠল না কারণ দুর্ভিক্ষের জন্য সরকার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী এবং অখণ্ডানন্দ দুজনেই প্রচণ্ড জ্বরে পড়লেন এবং পথিপার্শ্বে এক চটিতে কিছুদিন কাটাতে হল। সেখান থেকে রুদ্রপ্রয়াগ। এখানে পূর্ণানন্দ নামে এক বাঙালী সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কিছুদূরে এক ধর্মশালায় দুজনে আবার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আর চলতে পারলেন না।

গাড়োয়াল জেলার সদর-আমিন বদরীদত্ত যোশী দুই সাধুর অবস্থা দেখে তাদের চিকিৎসা করালেন এবং একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পর ডাণ্ডিতে করে নয় মাইল দূরে শ্রীনগরে পাঠিয়ে দিলেন। এখানে অলকানন্দার তীরে এক নির্জন কুটীরে নিশ্চিন্ত পঠন পাঠনে, গুরুভাইদের উপনিষদ পড়িয়ে মাসখানেক কাটিয়েছিলেন স্বামীজী। জীবিকার সাধন ছিল মাধুকরী ভিক্ষা।

সেখান থেকে তেহ্‌রী। তেহরীরাজের দেওয়ান, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অগ্রজ বাবু রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে পরিচয় হয় এখানে। স্বামীজী আবার গঙ্গাতীরে গিরিকন্দরে ধ্যানলীন হওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন। দেওয়ান রঘুনাথ গঙ্গা এবং ভিলাঙ্গনা নদীর সংযোগস্থলে গনেশপ্রয়াগে ব্যবস্থা করে দিতে চাইলেন।

কিন্তু সেই 'মুর্খ-বামুন' তো তাড়া করে ফিরছেন।

ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন অখণ্ডানন্দ। এবার গুরুতর অসুখ। ফুসফুস পরীক্ষা করে চিকিৎসক রায় দিলেন শীঘ্র সমতলে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

দেরাদুনের সিভিল সার্জনের কাছে একটি চিঠি লিখে সঙ্গে দিয়ে, রাহাখরচ সঙ্গে দিয়ে দেওয়ানজী তাঁদের মুসৌরী পাঠিয়ে দিলেন। মুসৌরী হয়ে দেরাদুন। সেখানে সিভিল সার্জন ডাঃ ম্যাকলারেন দেওয়ানজীর পত্রপাঠ অখণ্ডানন্দকে পরীক্ষা করলেন এবং ব্রঙ্কাইটিসের জন্য সময়সাপেক্ষ চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন।

"আমার গুরুভাই অসুস্থ, তার থাকা থাওয়ার জন্য সাহায্য করতে পারেন?" দ্বারে দ্বারে, জনে জনে এই ভিক্ষা করে বেড়িয়েছিলেন স্বামীজী। শিষ্যের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করে স্বামীজী চললেন হৃষীকেশ। কিন্তু আবার ধ্যানলীন হয়ে থাকার ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হল। এবারও বাদ সাধল নিজের শরীর। ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, প্রায় নাড়ী ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম। কাছাকাছি সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। গুরুভাইরা দুশ্চিন্তায় দিশাহারা। এক পাহাড়ী ওঝা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে এক দেহাতী দাওয়াই খাইয়ে সারিয়ে তুললে স্বামীজীকে সে যাত্রা। এই অসুখের সময় রামকৃষ্ণের শিষ্যেরা বুঝেছিল নরেন তাদের কাছে ঠিক কতখানি।

সেরে ওঠার পর ভাইয়েরা তাঁকে হরিদ্বারে নিয়ে গেল। কঙ্খল থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এসে যোগ দেন এবং সকলে সাহারানপুর হয়ে মীরাট গেলেন অখণ্ডানন্দের সঙ্গে দেখা করতে।

অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে দেখে অবাক হলেন। এত শীর্ণকায় তিনি তাঁকে কখনও দেখেন নি। এখানে যজ্ঞেশ্বরবাবুর সঙ্গে আলাপ হয় যিনি পরে স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন।

মীরাটে শেঠজীর বাগান ক্রমেই বরানগর মঠেই পরিণত হচ্ছিল। প্রচুর ভক্ত সমাগমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, অদ্বৈতানন্দের সান্নিধ্যে সংস্কৃত-সাহিত্যচর্চ্চা করে, ধ্যানগানে, পঠনপাঠনে আনন্দে সময় কাটতে লাগল। প্রায় পাঁচ মাস মীরাটে থাকার পর আবার অস্থির হয়ে উঠলেন স্বামীজী। বন্ধনহারা সন্ন্যাসীর একক জীবন আবার তাঁকে টানল।

অখণ্ডানন্দ সঙ্গে যেতে চাইলেন,—"গুরুভাইদের ওপর টান, এও মায়া। ঈশপ্রেমে, ইষ্টলাভে এতেও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। আর কোনওরকম মায়ায় আমি থাকতে চাই না।"

১৮৯১ খ্রীঃ জানুয়ারীর শেষের দিকে গুরুভাইদের মায়া কাটিয়ে, 'গণ্ডারের' মত 'একাকী দিল্লীর পথে বেরিয়ে পড়লেন,—না স্বামী বিবেকানন্দ নয়, স্বামী বিবিদিষানন্দ।

▫ শিষ্য মহারাজ ▫

দিল্লী এবং জয়পুরের মধ্যে, দিল্লীর শ'খানেক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, জয়পুরের মহারাজার অধীনে সেখাবতি বিভাগে এক ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। নাম 'খেত্‌ড়ী'। ১৮৪৩ থেকে ১৮৭০ এখানে রাজত্ব করেছিলেন রাজা ফতেচাঁদ সিং।

খেত্‌ড়ীর দেওয়ান ছিলেন, এ সময়ে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর বড় ভাই এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জ্যেষ্ঠতাত পণ্ডিত নন্দলাল নেহরু।

রাজা ফতে সিং ছিলেন নিঃসন্তান। অজিত সিং নামে একটি ছেলেকে দেখে রাজা ফতে সিং অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাকে পোষ্যপুত্র নেওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি নিজেও পোষ্যপুত্র ছিলেন।

মাত্র ২৭ বছর বয়সে ১৮৭০ সালে যখন রাজা ফতে সিং হঠাৎ মারা যান তখন তাঁর বিশ্বস্ত দেওয়ান পণ্ডিত নন্দলাল নেহরু রাজার এই ইচ্ছা পূর্ণ করাই মনস্থ করেন।

গ্রাম থেকে অজিত সিংকে আনিয়ে মাত্র ন'বছর বয়সের এই বালককে খেতড়ীর 'গদ্দী'তে রাজা হিসাবে তিনি অভিষিক্ত করেন।

নিয়ম অনুসারে এ ব্যাপারে জয়পুরের মহারাজা এবং ইংরাজ সরকারের অনুমতি নেওয়ার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু কারুরই অনুমতি পণ্ডিত নন্দলাল নেননি।

অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে যে রাজপুতানায় ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিনিধি মেজর ই, আর, সি, ব্র্যাড্‌ফোর্ডের রোষবহ্নি তাঁর উপর পড়বে তা তিনি ভালভাবেই জানতেন।

তাই খেত্‌ড়ীকে তার নতুন শাসক উপহার দিয়ে, দেওয়ান পদে ইস্তফা দিয়ে চিরতরে খেত্‌ড়ী ছেড়ে চলে যান পণ্ডিত নন্দলাল নেহরু।

এই নয় বছরের বালক অজিত সিং ভবিষ্যতে অত্যন্ত সুদক্ষ 'খেত্‌ড়ী-নরেশ' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণিত করেছিলেন।

কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তিনি কখনও শিক্ষালাভ করেন নি। কিন্তু নিজের চেষ্টায় এবং উৎসাহে পড়াশোনা করেছিলেন। সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু এবং

ইংরাজীতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। বিচক্ষণ বিচারশক্তি, এবং বিদ্যানুরাগের জন্য তাঁর রাজসভায় তৎকালীন বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নারায়ণ দাসজী, যাঁর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাভরে পাণিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। সভাগায়ক ছিলেন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ মুসরফ খান যিনি বিশ্ব সংগীত সম্মেলনে যোগ দিতে প্যারিসে গিয়েছিলেন। বেদচর্চার জন্য মিথিলা থেকে এসেছিলেন বিশিষ্ট বেদজ্ঞ পণ্ডিত সুন্দরলালজী ওঝা। আইন উপদেষ্টা ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরু।

মহারাজা অজিত সিং-এর চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত আধুনিক, এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনিই প্রথম রাজপুত রাজা যিনি ভূমিসংস্কার প্রবর্ত্তন করেন, হিন্দী ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং তাঁর সভার ভাষা হিসেবে প্রচলন করেন, যদিও পাশাপাশি সব রাজ্যেই উর্দু এবং ফারসী চলত। চিন্তাধারা খেতড়ীর কত আধুনিক ছিল তা শুধু একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। ১৮৮৬ সালে সমগ্র রাজপুতানায় প্রথম একটি ব্রাহ্ম সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় খেতড়ীতে।

আরও পরে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পরামর্শে ১৮৯৭খ্রীঃ রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যকালের হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে কালাপানি পেরিয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, রীতিমত ঝুঁকি নিয়ে।

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (১ম খণ্ড)' গ্রন্থে, তৎকালীন কয়েকটি পত্র পত্রিকা থেকে, 'ক্ষুদ্র রাজ্য খেতড়ীর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মর্যাদার' সম্বন্ধে দু'একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন :—

বম্বে গেজেট—১৮৯৭, অক্টোবর ২৫

"(খেতড়ীর রাজা) আলোক প্রাপ্ত শাসক হিসাবে বর্ণিত। গদীতে বসার পর পরে নিজ রাজ্যে তিনি বহুবিধ উন্নতিমূলক কাজ করেছেন।"

"জয়পুর ভিন্ন অপর সকল দেশীয় রাজার সঙ্গে খেতড়ীর রাজা সমব্যবহার করেন, বিভিন্ন রাজা, মহারাজা এবং লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর তাঁর রাজ্যে আতিথ্য নেন ; তিনি ফিরতি ভ্রমণও করেন ; দিল্লী সাম্রাজ্যের সঙ্গে খেতড়ীর সরাসরি সম্পর্ক আছে ; সেখান থেকেই খেতড়ীর রাজা-উপাধি এবং সনদলাভ ;

মারাঠাদের সঙ্গে ছিল খেতড়ীর পূর্ব্ব যোগাযোগ; বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত থেকে গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের মর্যাদা; এই সব সংবাদ উক্ত পত্রিকার ১৮৯৬, ১১ জুন সংখ্যা থেকে পাই।"

"খেতড়ীর উদারতা ও প্রজাবাৎসল্যের স্বীকৃতি পাই মহারাষ্ট্রের প্রধান অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দৈনিক টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়ার ১৮৯৩, ১০ নভেম্বর সংবাদে।

(এ ছাড়া) পুত্রজন্মের আনন্দোৎসব উপলক্ষ্যে মহারাজা এক লক্ষ দশ হাজার টাকার বকেয়া খাজনা ছেড়ে দিয়েছিলেন, অনাথ আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং ভারত সরকারের কাছে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য জিয়লজিষ্ট পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন ইত্যাদি।"

'এই খেতড়ির রাজা প্রথম নরেন্দ্রনাথের রাজা-শিষ্য হইয়াছিলেন'

'মুন্‌সী জগমোহনলাল রাজা সাহেবের দেওয়ান বা প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি রাজা অজিত সিং-এর ডান হাত স্বরূপ। মুন্‌সীজী ইংরাজী, সংস্কৃত, ফরাসী উর্দু ও আপন রাজস্থানের ভাষা জানিতেন এবং রাজনীতি ও কার্য্যকুশলতায় সুদক্ষ ছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক এই জন্য তিনি নিরামিষভোজী ও রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। তিনি আহ্নিক পূজা নিষ্ঠাভাবে করিতেন। মুনসী জগমোহনলাল নরেন্দ্রনাথের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষ অনুগত ভক্ত হইয়াছিলেন।'[২০]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত যদিও তাঁর 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী' গ্রন্থে এই পর্য্যায়ে নরেন্দ্রনাথ নামটি ব্যবহার করেছেন তবু এই সময়ে নরেন্দ্র নাথের নাম স্বামীজী, সত্যতঃ স্বামী বিবিদিষানন্দ ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন—"নরেন্দ্রনাথ যদিও পূর্ব পরিচিত ব্যক্তির কাছে নরেন্দ্রনাথ নামে অভিহিত হইতেন ও সেই ভাবেই নাম লিখিতেন, কিন্তু খেতড়ী অবস্থানকাল হইতে তাঁহাকে আলাপী ও ভক্তমণ্ডলীরা স্বামীজী বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।" আর খেতড়ী অবস্থানকালে স্বামীজীর নাম যে বিবিদিষানন্দ ছিল তা আমরা পরেও দেখতে পাব।

স্বামীজীর জীবনে, স্বামীজীর জগৎমান্য বিবেকানন্দ হয়ে ওঠার বিচিত্র ঘটনা পরম্পরায়, তাঁর স্বল্প কিন্তু সুদীর্ঘ কর্মজীবনে, বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি সান্নিধ্যের

২০। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৪১

প্রভাবে অনুভবে, জগতের কাছে সনাতন হিন্দুধর্মের বিশ্বদর্শন উপস্থাপনায়, প্রতিষ্ঠায়, খেতড়ীর মহারাজা অজিত সিং এবং তাঁর মুন্সী জগমোহনলালের ভূমিকা অতীব বলিষ্ঠ। এর মানে এই নয় যে অন্যান্যের বিশেষ করে অন্য রাজাদের, যাঁদের সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন তাঁদের ভূমিকা ছোট করে দেখার মত, এর মানে এই নয় যে বিবিদিষানন্দকে বিবেকানন্দ করে তোলার কৃতিত্ব এককভাবে মহারাজা অজিত সিং-এরই প্রাপ্য। এর মানে এও নয় যে অন্যদের অবদান তুচ্ছ বা হেয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যখন পৃথিবীতে আসেন তখন বোধ হয় তাঁদের জীবনপঞ্জীর চিত্রলেখ আগে থেকেই আঁকা থাকে।

অমুক না হলে রামকৃষ্ণ হত না, বা, তমুক না হলে বিবেকানন্দ হতে পারত না এ যেমন সত্যি হতে পারে না, তেমনি, এঁদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পূরক কিছু চরিত্র যথাসময়ে জীবন পথে উদয় হওয়ার জন্য পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। তাদের কাজটি তারা না করলে বা না করতে পারলে অন্য ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হত। কিন্তু এনার জন্য তিনি তৈরী (made for each other) ঘুঁটিগুলো দাবার ছকে আগে থেকেই চাল দেওয়া থাকে।

রাণী রাসমণি, মথুরমোহন, রামকৃষ্ণের জীবনালেখ্যে সময়োচিত ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আর বিবেকানন্দের জীবনে গ্রহণ করেছে মহারাজা অজিত সিং এবং জগমোহনলাল। মহারাজা এবং মুন্সী দুজনেই স্বামীজীর শিষ্য, আর প্রকাশ্যে না হলেও ঠাকুরের ভক্তশিষ্য কি রাণী, মথুর ছিলেন না? বিবেক-জীবনে খেতড়ীপর্ব তাই গভীর গুরুত্বপূর্ণ। আর এই রমতা-সাধুর (স্বামীজীর) জীবনে এই অধ্যায়ের সূত্রপাত সত্যই অনুধাবনযোগ্য।

শুধু সূত্রপাত নয়, বিবেকানন্দের উত্তর জীবনেও রাজাজী তাঁর এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্বামীজী বিবেকানন্দ হোন, কিন্তু যাতে নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্তে তিনি নিজের পথে এগিয়ে যেতে পারেন, নিঃশব্দে তার ব্যবস্থা করেছিলেন মহারাজা অজিত সিং আর মুন্সী জগমোহন-লাল।

সে ঘটনায় পরে আসছি।

মুন্সীজী সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন, "খেতড়ীর মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও আমি বর্তমানে একত্র আছি। আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও সহৃদয়তার

জন্য আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। রাজপুতানার জনসাধারণ যে শ্রেণীর লোককে 'তাজিমি সর্দার' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, এবং যাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং রাজাকেও আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে হয়, ইনি সেই সর্দারশ্রেণীর লোক। অথচ ইনি এত অনাড়ম্বর এবং এমনভাবে আমার সেবা করেন যে, আমি সময় সময় অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি···।"[২১]

এই মুন্সী জগমোহনলালই প্রথম স্বামীজীর সাক্ষাৎ পান 'মাউন্ট আবু'তে। ৪ জুন, ১৮৯১ সালে রাজাজীর চৈতন্যদিগন্তে এই জ্যোতিষ্কের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য সম্ভব করেন জগমোহন।

'বিধাতাই আবুপর্বতে স্বামীজীর চলার পথে খেতড়ীর মহারাজাকে ঠেলে দিয়েছিলেন,' বলেছেন স্বামীজীর জীবনীকার শিষ্যরা।

স্বামী বিবিদিষানন্দ দিল্লীতে এসে কিন্তু একা হতে পারলেন না। মীরাটে যে গুরুভাইয়েরা থেকে গিয়েছিল তারা দিল্লী এসে শুনল ইংরাজীতে কথা বলে এমন এক স্বামী বিবিদিষানন্দ সেখানে এসেছে।

কিন্তু স্বামীজী এই অযাচিত সাক্ষাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। যদিও সে সাক্ষাৎ নেহাতই ঘটনাচক্রে। 'আমি তোমাদের আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আমি একা হতে চাই, আমাকে অনুসরণ করো না। আমি দিল্লী ছেড়ে চললাম। তোমরা আমার নির্দেশ পালন কর। আমার সন্ধান করার চেষ্টা করো না। পুরান পরিচিতির থেকে আমি দূরে সরে যাব। আত্মা আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে বনভূমি, মরুভূমি, পর্বত অথবা ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ, সেখানেই আমি যাব। আমি চাই প্রত্যেকে নিজ প্রেরণায় নিজ নিজ লক্ষ্যে ধাবিত হোক্।'

আর তিনি নিজে তাঁর পথে চললেন 'আলোয়ার'। সম্পূর্ণ একাকী। আলোয়ারে গুরুচরণ সরকার নামে এক বাঙ্গালী চিকিৎসকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় একটা আস্তানা খুঁজে পান বাজারের মধ্যে। এখানে একজন মৌলভী সাহেবের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। মৌলভী সাহেবের সঙ্গে তিনি পবিত্র কোরাণ নিয়েও বিদগ্ধ আলোচনা করেন। এই মৌলভী সাহেব স্বামীজীর একজন অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

২১। পত্রাবলী পত্র ৬৮।

ক্রমে ক্রমে ভক্ত দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। তিনিও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই ধর্মচর্চা, স্মরণ, মনন করতে লাগলেন। সকলের সব প্রশ্নেরই জবাব দিতে লাগলেন।

'মশায় আপনি গেরুয়া কেন পরেন?'—'কারণ এ হচ্ছে ভিখারীর বেশ ভিখারীর কাছে কেউ হাত পাতে না। আর হাত কেউ পাতলে আমার তাকে ফিরিয়ে দিতে কষ্ট হয়।' 'মহাশয়, আপনার জন্ম কোন কুলে?'—নির্দ্বিধা উত্তর—'কায়স্থ'।

আলোয়ারের মহারাজা ছিলেন মঙ্গল সিংজী। তাঁর দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী লোকমুখে এই সাধুর কথা শুনতে পেয়ে মহারাজের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। দেওয়ানজীর বাড়ীতে মহারাজা মঙ্গল সিং এই ইংরাজী জানা সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সেই প্রথম সাক্ষাতের কথোপকথন আজ ইতিহাস হয়েছে। "স্বামীজী মহারাজ, আপনি জ্ঞানী, পণ্ডিত। আপনি কেন ভিক্ষাবৃত্তি করেন? ইচ্ছা করলেই তো আপনি যথেষ্ট রোজগার করতে পারেন?" "মহারাজা বলুন তো, রাজকাজ ছেড়ে আপনি কেন শুধু শিকার করে বেড়ান আর সাহেব সুবোদের সঙ্গে সময় কাটান?"

"কেন ঠিক বলতে পারব না তবে নিশ্চয়ই ভাল লাগে বলে।"

"ঠিক এই কারণেই আমি ভবঘুরে ফকির, রাজাজী।"

পরের প্রশ্নে বারুদ ছিল, "বাবাজী মহারাজ, পুতুল পূজোয় আমার বিশ্বাস নেই। আমার কি হবে?"

"নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন?" "না স্বামীজী; অন্য সকলের মত আমি সত্যিই কাঠের টুকরো, মাটির তাল, পাথর খণ্ড অথবা ধাতুপিণ্ডকে পূজো করতে পারি না। আমার কি কিছু হবে না?"

"ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে স্বাধীন মত পোষণের অধিকার সকলেরই আছে।"

প্রজ্বলিত দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দেওয়ালে টাঙ্গান রাজাজীর প্রতিকৃতির উপর। দেওয়ানজী ছবিটি নামিয়ে আনলেন স্বামীজীর অনুরোধে।—

"এর ওপর থুতু ফেল, তোমরা সকলেই এ কাজ করতে পার। দ্বিধা সংকোচের কারণ নেই। এতো এক টুকরো কাগজ।"

দেওয়ানজী বললেন, "স্বামীজী কি বলছেন? আমাদের মহারাজের

ছবি এটা"।

"কোথায় মহারাজ? তাঁর রক্ত মাংস এতে নেই। এ ছবি মহারাজের মত চলে না, বলে না। তোমরা তবু তাঁর ছায়া এই কাগজে দেখতে পাচ্ছ। এটার অপমান মনে করছ মহারাজেরই অপমান।"

মহারাজের দিকে ফিরে বললেন, "মহারাজ ধাতুপিণ্ডকে প্রস্তরখণ্ডকে কেউ পূজা করে না। আমি আজ পর্য্যন্ত কোনও ভক্তকে বলতে শুনিনি—হে পাথর আমায় উদ্ধার কর আমায় দয়া কর।"

অভিভূত মঙ্গল সিং বললেন স্বামীজী এমন করে কেউ আজ পর্য্যন্ত পৌত্তলিকতার নিহিতার্থ বুঝিয়ে বলেনি আমাকে।

আলোয়ার থেকে পাণ্ডুপোল হয়ে নারায়ণী গ্রাম। সেখান থেকে ট্রেনে জয়পুর, একা।

জয়পুরে সর্দার হরি সিং এর সঙ্গে আলাপ হয়। সর্দার হরি সিং মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করতেন না। স্বামীজীও তাঁকে বিশ্বাস করাতে পারেন নি। বেদান্তে দৃঢ় বিশ্বাসী সর্দার হরি সিং এর সঙ্গে একদিন বেড়াতে বেড়াতে স্বামীজী দেখলেন কিছু ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি নিয়ে ভক্তিগীতি গাইতে গাইতে পথে যাচ্ছে। সর্দারকে ছুঁয়ে দিয়ে স্বামীজী বললেন 'জ্যান্ত ভগবান দেখ'। হরি সিং দেখলেন সেই ছবি। ভাবাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল দুচোখ দিয়ে। সম্বিত ফিরলে সর্দার বললেন, "স্বামীজী এত তর্ক বিতর্ক আমাকে বিশ্বাস করাতে পারেনি। তোমার ছোঁয়ায় বুঝলাম।" শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে পড়ে যায় না?

১৮৯১ সালের গ্রীষ্মকালে স্বামীজীকে দেখা যায় আবু পর্বতে। আর এই আবু পর্বতেই বিধির বিধান, স্বামীজীর যাত্রাপথে এক ভবিতব্য সংঘটন করেছিল যা স্বামীজীকে অদূর ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগতকে উপহার দিয়েছিল। এই যোগাযোগ ভাগ্যবিধাতার। এ যোগাযোগ, পূর্ব-ধুপরিকল্পিত, পূর্ব নির্দিষ্ট, পূর্ব-নির্ধারিত। কারণ এর প্রভাব সুদূর প্রসারী শু নয়, জগৎবিদারী। এই সূত্রে এমন একজন মানুষের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাত (যোগাযোগ) ঘটেছিল যাঁর অবদান, যাঁর প্রভাব, যাঁর আত্মনিবেদন স্বামীজীর জীবন প্রসারী। শুধু স্বামীজীর একার নয়, যাঁরা স্বামীজীর আপনার; যাঁরা স্বামীজীর সাথে জন্মসূত্রে দায়বদ্ধ, তাঁদেরও ঋণ এই অকৃপণ, গুরুচরনে উৎসর্গী-কৃত মানুষটির কাছে কম নয়। স্বামীজীর চলার পথে, ক্ষুরধারসম কঠিন পথে, পদে পদে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, এই মানুষটির উৎসর্গ জড়িয়ে আছে।

স্বামীজী মহারাজের গুরুপ্রণাম, খেতড়ী মহারাজের গুরুপ্রণামী ; কালের মাপকাঠিতে বিভিন্ন হলেও অভিন্ন। নরেনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যা করেছেন, করতে চেয়েছেন, 'স্বামীবিবিদিষানন্দ—বিবেকানন্দের' জন্য খেতড়ী নরেশ যা করেছেন, আত্মার আত্মীয়তার তুল্যমূল্যে তা সমতুল। গুরু-মহারাজ লোক-দীক্ষার কঠিন ব্রতনিপাতে সংসার-বিরাগী শিষ্য-তনয়কে রেখে গেলেন।

আর শিষ্য মহারাজ, স্বামীজীর রাজ-শিষ্য, জগদ্ধিতায় জগদ্দীক্ষার্থ, নিঃস্বার্থ, 'মা-ফলেষু-কদাচন'—সেবায়, সান্নিধ্যে, সাহচর্যে, স্বোৎসর্গে, তাঁর গতিপথে তাঁকে চক্রমিত করলেন।

খেতড়ীপর্ব তাই স্বামীজীবনে, প্রস্তুতিপর্ব, প্রস্থিতি পর্ব, সিদ্ধিপর্বও (বলা যায়)। আর প্রেরণার উৎসরূপে এ পর্ব যে এককেন্দ্রিক , তা আমরা পরে দেখব। স্বামীজীর জীবনীকারেরা বলেছেন (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ)—ভাগ্য-বিধাতা, আবু পর্বতে, তাঁর গতিপথে, খেতড়ীর মহারাজাকে প্রস্থিত করলেন'—স্বামী একটি জনমানবশূন্য গুহামধ্যে কঠিন-কঠোর করছিলেন। লোটা-কম্বল ছাড়া সর্বস্ব বলতে ছিল কয়েকখানি বই। একদিন এক মুসলমান উকিল সে পথ দিয়ে যেতে যেতে স্বামীজীর রাজপুরুষোচিত রূপসন্দর্শনে, সুগম্ভীর বাক্যালাপে, বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে শুধালেন তিনি স্বামীজীর কোনও সেবায় লাগতে পারেন কি না। "উকিল সাহেব, বর্ষা আসছে। এই গুহার কোনও দরজা নেই। একজোড়া দরজা করে দিতে পার ?" "কৃতজ্ঞ উকিল সাহেব বললেন "স্বামীজী এ গুহায় থাকা যায় না, আমি একা থাকি, আমি ধন্যজ্ঞান করব, আমার সঙ্গে থাকুন।" স্বামীজী রাজী।

"স্বামীজী আমি মুসলমান। আপনার থাকা খাওয়ার ভিন্ন বন্দোবস্ত করব।" সে কথায় কান দিলেন না স্বামীজী।

.. এই উকিলসাহেব এবং তার সহকর্মীদের গুণে স্বামীর কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। স্বামীজীর পরিচিতদের পরিধি বাড়ল। কোটার মহারাজ, তাঁর মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিং, সবাই সেই তালিকায়।

কয়েকদিন পর উকিল সাহেব ডেকে নিয়ে এলেন—মুন্সী জগমোহনলালকে, খেতড়ী মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী। স্বামীজী তখন কৌপিনমাত্র পরিধানে বিশ্রামরত।'

মুন্সী দেখে ভাবলেন, 'আবার এক সাধারণ সাধু, সাধারণ চোর, সাধারণ ঠগ'—

স্বামীজী জেগে উঠলেন—"স্বামীজী আপনি হিন্দু, সন্যাসী। আপনি মুসলমানের সঙ্গে বাস করছেন? আপনার ভোজ্য মুসলমানের ছোঁয়ায় অপবিত্র হতে পারে।"

প্রজ্বলিত চক্ষুদ্বয় আবার অগ্নি-উদগীরন করল—"আমি সন্ন্যাসী, আমি আপনার সমাজের উর্দ্ধে। আমি ভাঙ্গীর সঙ্গে একাসনে ভোজন করতে পারি। ভগবানের ভয় নেই, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ আছে, শাস্ত্রের ভয় নেই শাস্ত্রনিধান সম্মতি দেয়, কিন্তু আপনাদের ভয় আছে আপনাদের সমাজকে ডরি। কারণ আপনারা ঈশ্বর বা শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে না জেনেই বিধান দেন। আমি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করি, কীটানুকীটে, নিকৃষ্টতম জীবে। আমার কাছে উচ্চ নেই, নীচ নেই। শিব, শিব।"

শুধু বচন নয়; উদ্দীপ্ত বাচনভঙ্গী অবাক করেছিল অভিজ্ঞ মুন্সী জগমোহন লালকে। আর সে ভঙ্গী যে এক সাধারণ ভণ্ড সাধুর ভঙ্গী নয় এও বুঝে ছিলেন বিচক্ষণ, পরিণতবুদ্ধি মুন্সীজী। আর বুঝেছিলেন মহারাজের সঙ্গে এই সন্ন্যাসীর অবশ্যই পরিচয় হওয়া উচিত।

রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন স্বামীজীকে জগমোহনলাল।

"বেশ আমি পরশুদিন যাব"।

সাক্ষাতের বিবরণ মহারাজকে জানালেন মুন্সীজী।

সোৎসাহে মহারাজ বলে উঠলেন, "আমি নিজেই তাঁকে দেখতে যাব"।

এ খবর জেনে অবশ্য স্বামীজী নিজেই চলে এলেন রাজপ্রাসাদে, দেখলেন, উষ্ণ অভ্যর্থনায় প্রসারিতহস্ত খেতড়ী নরেশ।

প্রথম দর্শনেই দুজনে দুজনের গুঞ্জন বুঝেছিলেন। আন্দাজ করেছিলেন পরস্পরের ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা।

তৎকালীনঅখ্যাত এই সাধুর মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিত রাজাজী পেয়েছিলেন তা তাঁকে ভাবিয়েছিল, আর স্বামীজী রাজাড়ম্বরের আড়ালে দেখেছিলেন অকপট নিষ্ঠাবান একটি বন্ধু প্রাণ। আকর্ষণটা পারস্পরিক।

খেতড়ী নরেশ এবং বিবেকানন্দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতাটুকু যথাগুরুত্বে বিধৃত করেননি তাঁর জীবনীকারেরা, বিশেষতঃ মহারাজা অজিত সিং

এর ভূমিকা যথা মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নয় ; কিছুটা উপেক্ষিত, এ ছাড়া জগৎবাসীর সামনে চিকাগো ধর্ম মহাসভার পাদপ্রদীপের আলোয় স্বামী বিবেকানন্দকে উপস্থিত করার ব্যাপারে রাজা অজিত সিং এর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা এবং ফলপ্রসূ অবদানের কথাও যথাযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেনি উত্তরকালের বিবেক চর্চায়।

এ রকম মনে করার কারণ আছে এবং স্পষ্ট ভাবেই এই অনুযোগ করেছেন শ্রীবেণীশঙ্কর শর্মা তাঁর গবেষণা গ্রন্থ Swami Vivekananda – A Forgotten Chapter Of His Life (স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায়) এ।

বিস্মৃত কথাটা অবশ্য একটু বাড়াবাড়িই হয়েছে অবহেলিত অথবা উপেক্ষিত বললে ঠিক হত।

কিন্তু বেণীশঙ্করজীর বলার কথাটি গ্রন্থটির নামকরণেই স্পষ্ট।

স্বামীজীর জীবনের এই অধ্যায় এবং বেণীশঙ্করবাবুর দাবী নিয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

স্বামীজীর জীবনে খেত্‌ড়ীপর্বের প্রভাব এবং তাঁর আত্মীয়বর্গের খেত্‌ড়ী-মহারাজ এবং মুন্সী জগমোহনলালের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকার কথা শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত তাঁর 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী' গ্রন্থে সবিশেষ লিখেছেন। সর্বোপরি স্বামীজী নিজে তাঁর বিভিন্ন পত্রাবলীতে তাঁর জীবনের এই অধ্যায় সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছেন। তবে যে পত্রগুলি সংরক্ষিত হয়েছে তার চেয়ে বেশী খবর পাওয়া যেত মনে হয় যে পত্রাবলী সংরক্ষণ করা যায়নি তাতে।

"(স্বামীজী) তিনি নিশ্চয়ই হাজার হাজার পত্র লিখেছেন তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি পত্র সংরক্ষিত এবং মুদ্রিত হয়েছে।

বেণীশঙ্করজী ভাগ্যবশতঃ অবশ্য কতকগুলি অপ্রকাশিত চিঠি পেয়ে যান, পণ্ডিত ঝাবরমলজী শর্মার অনুগ্রহে। এ রকম একটি পত্র—

ব্যালেন ভিলা

দার্জিলিং

প্রিয় জগমোহন ১৫ এপ্রিল' ৯৮

জাপান ইউরোপ এবং আমেরিকা যাওয়ার পথে এবং সেখানে থাকার সময়ে মহামান্য মহারাজকে আমি যে সকল পত্র লিখেছিলাম সেগুলি যদি খুঁজে

পান তাহলে অনুগ্রহ করে সেগুলি যত্নসহকারে বেঁধে ছেঁদে রেজিস্ট্রী যোগে আমার মঠের ঠিকানায় যত শীঘ্র সম্ভব পাঠিয়ে দিবেন।

আশীর্ব্বাদান্তে—

আপনার

বিবেকানন্দ

জগমোহনলাল মঠের ঠিকানায় পত্রগুলি পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত পত্রাবলীতে স্থান পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই যে পত্রগুলিতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলি প্রকাশিত হয় নি। কারণ স্বামীজী রচিত গ্রন্থাবলীর মতই তাঁর পত্রাবলীও লোকশিক্ষার বহুমূল্য আকর।

তবে দুর্ভাগ্য এই অপ্রকাশিত পত্রগুলি আর বেলুড় মঠের গ্রন্থাগারে খুঁজে পাওয়া যায় না। মুন্সী জগমোহনলালও মনে হয়—পত্রগুলির অনুলিপি রাখেননি এবং তা আর আজ লভ্য নয়।

এই অপ্রকাশিত পত্রাবলী ছাড়াও বেণীশঙ্করজী আমাদের আর একটি অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়েছেন। সেটি হল খেতি্‌ড়িরাজ্যের 'ওয়ক্যাত রেজিস্টার'। এটি একপ্রকার ডায়েরী (দিনলিপি) বিশেষ। স্বল্পশিক্ষিত (রাজকর্মচারী) 'ওয়ক্যাত নবিশেরা' এই ডায়েরী লিখত। স্থানীয় এবং তৎকালীন রাজস্থানী ভাষায় 'ওয়ক্যাত রেজিস্টার' লিখিত। দিন, ক্ষণ এবং তারিখ দিয়ে বিশ্বস্ত-ভাবে ওয়ক্যাত নবিশেরা এতে নথিবদ্ধ করেছেন রাজপ্রাসাদে স্বামীজীর আসা যাওয়া। কিন্তু শাস্ত্রালোচনা অথবা আলোচনার বিশদ বিবরণ এতে নেই বোধ্য কারণেই।

কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে খেত্‌ড়ীর মহামান্য মহারাজের সম্পর্কের আসল রূপটি এই অমূল্য ডায়েরীতে প্রায় ভিডিও রেকর্ডের মতোই পরিষ্কার।

বেণীশঙ্করজী তাঁর গ্রন্থে পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করে এই ওয়ক্যাত রেজিস্টার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন স্বামীশিষ্য সংবাদের দিনপঞ্জীর। আবুপাহাড়ে প্রথম সাক্ষাতের দিন ৪ঠা জুন ১৮৯১ থেকে ২৭শে অক্টোবর ১৮৯১ স্বামীজীর প্রথমবার খেত্‌ড়ীত্যাগের দিন পর্য্যন্ত। এই অমূল্য দলিল খেত্‌ড়ীপর্বের, বিস্মৃতি পর্বের অভ্রান্ত সাক্ষী হয়ে রইল। এই কয়েকটি গ্রন্থে বিধৃত বিবৃতি থেকে শিষ্য-মহারাজ-খেত্‌ড়ী-নরেশ, অজিত সিং ও স্বামী বিবিদিষানন্দ

বিবেকানন্দের জীবনের আলো আঁধারীর যে পরিচয়টি পাওয়া যায় তার মূল তিনটি দিক আছে।

১—স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্য মহারাজের, শিষ্য মহারাজের সঙ্গে স্বামীজীর ব্যক্তিগত অথবা এবং গুরুশিষ্যগত সম্পর্কের দিক।

২—স্বামীজীর আমেরিকাযাত্রায় খেতড়ী নরেশের অবদান।

৩—স্বামীজীর আত্মীয়বর্গের ভরনপোষণের ব্যাপারে রাজা অজিত সিং এর অভিভাবকত্ব প্রদান।

মূলতঃ এর উপরেই এই সুস্থ, সুন্দর, সরল, সবল, অনাবিল, নিষ্কলঙ্ক সম্পর্কটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

কারণ বিবেক সম্বন্ধীয় রচনায়, আলোচনায়, এই অধ্যায়টি তার ন্যায্যমূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই মর্মে বেণীশঙ্করজীর সিদ্ধান্ত তথ্যের বিচারে যথার্থ বলেই মনে হয়েছে।

ওয়ক্যাত রেজিস্টার—বৃহস্পতিবার ৪ঠা জুন ১৮৯১ ক্যাম্প আবু পর্বত :—

'মহামান্য সকাল সাড়ে ছটায় ঘুম থেকে উঠলেন। ১১টায় দ্বিপ্রাহরিক ভোজন হল। ২টো বেজে ৪৫ মিঃ বড় সাহেব কর্নেল ট্রেভর সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজপোষাক পরে অশ্বারোহণ করে রেসিডেন্সীতে গেলেন। পরে ডাঃ স্পেন্সারের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি যোধপুরের মহারাজা প্রতাপ সিং এর সঙ্গে দেখা করেন এবং সেখানে প্রায় ১৫ মিনিট থাকেন। বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে কোঠীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৪টার সময় আবুতে লরেন্স স্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগ দিতে যান। ৭টার সময় অশ্বপৃষ্ঠে মহারাজা প্রতাপ সিং এর সঙ্গে ফিরে আসেন। তিনি আধঘণ্টা থেকে চলে যান। তারপর মহামান্য কিছুক্ষণ বই পড়েন। কিছুক্ষণ পর একজন সন্ন্যাসী আসেন। তিনি বাংলা মুলুকের লোক এবং ইংরাজী ও সংস্কৃতে পারদর্শী। তাঁর সমস্ত শরীরে সাধুতার লক্ষণ। রাজা সাহেব তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। যোধপুরের হরদয়াল সিংহজী উপস্থিত ছিলেন। ৮টার সময় রাজা সাহেব নৈশভোজ সারেন। ১০টা ৩০ মিনিটে হরদয়াল সিংহজী গেলেন আর ১১ টায় সন্যাসীও গেলেন। সন্যাসীকেও ভোজন দেওয়া হয়েছিল।'

কি কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা অল্পশিক্ষিত ওয়ক্যাত নবিশেরা লিখে রাখেনি

কিন্তু জীবনীকারেরা বলেছেন, "স্বামীজী জীবন কি ?"

"প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক যখন সত্তার শ্বাসরোধ করে তখনও প্রস্ফুটন তখনও উন্মীলনের নামই জীবন।"

মুগ্ধ মহারাজা প্রশ্ন করলেন, "তাহলে স্বামীজী শিক্ষা কাকে বলব ?"

"আমি বলব, কতকগুলি ধারনার স্নায়বিক যোগবিন্যাসের নামই শিক্ষা।"

ব্যাখ্যা করে বললেন আহৃত ধারণা যতক্ষণ না সাহজিক (সহজাত) হয়ে উঠছে ততক্ষণ সে চেতনার অঙ্গ হতে পারে না।

তারপর রাজাজী নিস্পন্দ হয়ে শুনতে লাগলেন স্বামীজীর মুখ নিঃসৃত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন কাহিনী। এই প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই দেখাসাক্ষাৎ, শাস্ত্রালোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলতে লাগল।

ওয়ক্যাত রেজিষ্টার থেকে দেখতে পাই ক্যাম্প আবুতেই এরপর ৬ই জুন, ১১ই জুন, ১৫ই জুন, ২২শে জুন, ২৩শে জুন, ২৪শে জুন, ২৭ জুন, ৪ঠা জুলাই, ৬ই জুলাই, ৮ই জুলাই, ৯ই জুলাই, ১১ই জুলাই, ১৪ই জুলাই, ১৭ই জুলাই, ১৮ই জুলাই, তারিখে স্বামীজী মহামান্যের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং আলাপ আলোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করেছিলেন। প্রতিদিনের বর্ণনাই প্রায় একই রকম। ওয়ক্যাত নবিশেরা আলোচনার বিষয়বস্তু বিস্তারে লিপিবদ্ধ করতে পারেনি কিন্তু আসা যাওয়া এবং খাওয়া দাওয়া আলাপ আলোচনার সময়গুলি ঠিকমতই লিখে রেখেছে। শিক্ষা, দর্শন, শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হত ইংরাজী এবং সংস্কৃতে। সময় সময় স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি, রাজা রাজড়া, এবং পণ্ডিতেরাও উপস্থিত থাকতেন। আর হত গান। স্বামীজী গাইতেন মহামান্য হারমোনিয়ম বাজাতেন।

একটা ধারনা দেবার জন্য তিন দিনের ওয়ক্যাত রেজিস্টার তুলে দিচ্ছি :—২৭ জুন ১৮৯১ শনিবার ক্যাম্প আবু :—স্বামীজী এলেন। মাঝখানের ঘরে বসে মহামান্যের সঙ্গে কথা বললেন। ১১টা ৩০ মিঃ দুজনে মধ্যাহ্নভোজ সারলেন। দুপুরবেলা মহামান্য মিঃ পাইলটের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। কিছুক্ষন স্বামীজীর সঙ্গে কথা বললেন তারপর মহামান্য হারমোনিয়ম বাজালেন এবং স্বামীজী গান করলেন। তারপর তাঁদের আলোচনা বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত চলল।:

শনিবার ১১ই জুলাই ক্যাম্প আবু :—৭টায় উঠলেন। একটি চুরুট খেয়ে

প্রাত্যহিক কাজকর্ম করার পর দলিল আদি দেখলেন এবং কিছু ডাক দেখলেন। ১১টার সময় মধ্যাহ্নভোজ এবং তারপর অনেকক্ষণ স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন।: মঙ্গলবার—১৪ই জুলাই—ক্যাম্প আবু :—মাঝের ঘরে বসে কিছুক্ষণ দাবা খেললেন। ১১টার সময় মধ্যাহ্নভোজ সারলেন। স্বামীজী এলেন এবং তাঁর সঙ্গে দর্শন বিষয়ে আলোচনা করলেন।

স্বামীজী এবং রাজাজী শুধু যে ধর্ম বা দর্শনই আলোচনা করতেন তাই নয় একসঙ্গে বেড়াতেন, একত্রে ঘোড়ায় চড়তেন এবং বলা যায় একত্রে উঠতেন বসতেন। প্রায়ই দেখি রেজিস্টারে লেখা ; রাজাজী বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বা অন্য কোনও কাজে অল্প সময়ের জন্য বাইরে যাচ্ছেন আবার যতশীঘ্র সম্ভব কাজ সেরে এসে স্বামীজীর সান্নিধ্যে আলোচনায় বসছেন। দাবা খেলা ছেড়ে স্বামীজীর কাছে উঠে আসছেন। আবার কখনও মুন্সী জগমোহনলাল জরুরী কাগজপত্র স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনারত অবস্থাতেই রাজাজীকে দিয়ে সই সাবুদ করিয়ে নিচ্ছেন।

মহামান্য অজিত সিং সে সময়কার রাজপুতানায় একজন দক্ষ বীণাবাদক ছিলেন। স্বামীজীর গানের গলা সর্বজনবিদিত। রাজাজী কখনও বীণায় কখনও হারমোনিয়াম সঙ্গত করতেন। মহারাজা হিসাবে একজন সাধুর সঙ্গে গানের সঙ্গত করা প্রায় অকল্পনীয়ই ছিল। অভাবনীয় এও ছিল যে রাজাজী প্রায় প্রতিদিনই স্বামীজীর সঙ্গে একত্র আহার করতেন।

স্কুলে কলেজে না পড়লেও রাজাজীর জ্ঞানের স্পৃহা ছিল অপরিসীম। ধর্ম এবং শাস্ত্র ছাড়াও রাজাজী স্বামীজীর কাছে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং গ্রহবিজ্ঞান শিক্ষা করেছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্র রাজাজীকে দিয়ে স্বামীজী কিনিয়েছিলেন এ জন্য, এবং রাজপ্রাসাদের উচ্চতম প্রকোষ্ঠে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রও বসিয়েছিলেন। একটি ছোট গবেষণা গৃহও তৈরী করেছিলেন এবং রাজপুতানার পরিচ্ছন্ন আকাশে গ্রহনক্ষত্র নিরীক্ষন করতে করতে সময়ে সময়ে রাত্রিও কাটিয়ে দিতেন।

আবু পর্বত ত্যাগ করে খেতড়ীতে ফিরে যাওয়ার সময় রাজাজী স্বামীজীকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজীও এতে রাজী হন।

প্রথমবার স্বামীজী খেতড়ীতে ছিলেন প্রায় পাঁচ মাস। পরিব্রাজক রমতা সাধুর পক্ষে এও কিন্তু নামঞ্জুর! এ থেকেই বোঝা যায় শুরু থেকেই এই সম্পর্ক

চিরস্থায়ী হবার ছিল।

মহারাজ, অজিত সিংজী ১৮৯১ সালের ২৪শে জুলাই আবু পর্বত ছাড়েন এবং ১৫ই জুলাই আজমীর হয়ে জয়পুর পৌছান ট্রেনে।

এখানে 'খেতড়ী-হাউস' এ স্বামীজী তাঁর সঙ্গে আসেন।

এই পর্বের ওয়ক্যাত রেজিস্টার থেকে দু একটি উদ্ধৃতি :—

বুধবার—২৯শে জুলাই ১৮৯১ ক্যাম্প জয়পুর :—প্রাসাদের মাঝের ঘরে বসে মহামান্য দাবা খেললেন। সুরাপানের ব্যবস্থা ছিল। স্বামীজীর সঙ্গেও কিছুক্ষণ কথা বললেন।

রবিবার ২রা আগষ্ট—ক্যাম্প জয়পুর :—সন্ধ্যাবেলা একটু ভ্রমণে বেরোলেন। সাতটার সময় ফিরলেন। নারায়ণ সিংজী, বাহাদুর সিংজী, হরি সিংজী এবং স্বামীজীর সঙ্গে কথা বললেন।

৩রা আগষ্ট ১৮৯১ তারিখে ট্রেন যোগে মহামান্য জয়পুর ছেড়ে খেতড়ীর পথে খৈরথাল পৌছলেন বিকাল ৪টায়। রাত্রিটা খৈরথালে থেকে আবার যাত্রা শুরু করে কোট পৌছলেন ৬ঠা আগষ্ট। ৫ই আগষ্ট কোট থেকে যাত্রা শুরু করে ৭ই আগষ্ট পৌছলেন খেতড়ী। সঙ্গে স্বামীজী।

খেতড়ী পর্বের ওয়ক্যাত রেজিষ্টার থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি :—

রবিবার—১৩ই আগষ্ট—

৭টা ৪৫ মিনিট প্রজারা সম্মান জানাতে এলে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। স্বামীজী এলেন এবং তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হল এবং স্বামীজী একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখলেন। এটি ইংলণ্ড থেকে সারিয়ে আনা হয়েছিল।

১৫ আগষ্ট শনিবার :—

মহামান্য দূরবীক্ষণটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ৯টার সময় স্বামীজী এলেন এবং তাঁরা বই পড়লেন। কিছুক্ষণ হারমোনিয়ম বাজালেন এবং ১১টার সময় স্বামীজীর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে বসলেন।

১৯শে আগষ্ট বুধবার :—

মহামান্য মন্দিরপ্রাসাদে গেলেন। সেখানে গালিচায় বসে স্বামীজী, পণ্ডিত লক্ষীনারায়ণজী এবং পণ্ডিত নারায়ণ দাসজীর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করলেন।

২৪শে আগষ্ট সোমবার :—সরোবর

সরোবর ছেড়ে স্বামীজীর ডেরায় গেলেন এবং ৮টা পর্য্যন্ত কথাবার্তা বলে আবার ফিরে এলেন।

১লা অক্টোবর—বৃহস্পতিবার ক্যাম্প সরোবর :—

অজিত নিবাস উদ্যানে গেলেন। সেখানে লন টেনিস খেলা হল। শ্রাদ্ধ এবং অগ্নিহোত্র পূজা করবার পর সরোবরে ফিরে এলেন। ছত্রীতে বসে স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন।

২৭শে অক্টোবর মঙ্গলবার :—

স্নানপূজা সেরে ১০টার সময় ছবি নিবাসে বসে পড়াশোনা করলেন। ১১টার সময় মধ্যাহ্নভোজ সারলেন। মুন্সী জগমোহনলালজী এসে কিছু কাগজ পত্র দিলেন। দুপুরবেলা আরও কিছু কর্মচারী এসে সরকারী ব্যাপারে আলোচনা করলেন। ২টার সময় সকলে চলে গেলেন এবং স্বামীজী এসে আলোচনা করলেন, প্রতি দিনের মত।

এরপর ওয়ক্যাত রেজিস্টারে স্বামীজীর উল্লেখ নেই তাই মনে হয় প্রায় পাঁচ-মাস থাকার পর স্বামীজী খেতড়ী ছেড়ে গিয়েছিলেন।

ওয়ক্যাত রেজিস্টারের লেখা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বামীজী ৪ঠা জুন ১৮৯১ থেকে ১৮ই জুলাই ১৮৯১ পর্য্যন্ত আবুতে ছিলেন। সেখান থেকে মহারাজার সঙ্গে জয়পুরে যান। জয়পুরে খেতড়ী হাউসে মহারাজার সঙ্গে ছিলেন ২৪শে জুলাই থেকে ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত। সেখানে থেকে তাঁরা খেত্ড়ীতে যান। এবং স্বামীজী খেতড়ীতে ছিলেন অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত। প্রথম আলাপে রাজাজীর সঙ্গে স্বামীজী প্রায় পাঁচ মাস কাটিয়েছিলেন।

খেত্ড়ী রাজ্যের ওয়ক্যাত রেজিস্টারে স্বামী বিবেকানন্দ নামটিরই উল্লেখ আছে। স্বামীজীর এই নাম কিন্তু হয়েছিল অনেক পরে!

এই ভুলের কারণ হল ওয়ক্যাত নবিশেরা খোলা কাগজে এই ডায়েরী লিখত। এক বছর বা দুই বছর পরে রাজাজীর অনুমোদন পাওয়ার পর এগুলি ভালভাবে আবার লিখে নথিবদ্ধ করা হত। তাই মনে হয় প্রথমে খোলা কাগজে স্বামীজী হিসাবে বর্ণিত হলেও পরে নামটি বিখ্যাত বিবেকানন্দ হিসেবেই নথিভুক্ত করা হয়।

এই সংশোধন স্বামীজীর বিশ্ববিজয়ের আগেও হয়ে থাকতে পারে, কারণ

আমেরিকা যাত্রার পূর্বেই খেতড়ীতে তাঁর রাজশিষ্যের অনুরোধেই স্বামীজী 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করেন। চিকাগো ধর্মসভায় যে নামটি জগৎবাসীর মুখে মুখে জগৎজোড়া প্রচার পেল সে নাম দিয়েছিলেন মহামান্য মহারাজ নিজে।

স্বামীজীর নামকরণের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন পণ্ডিত ঝাবরমলজী শর্মা তাঁর 'খেতড়ী নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' গ্রন্থে। এই ঘটনা তাঁকে বলেছেন মুন্সী জগমোহনলাল এবং মুন্সীর উপস্থিতিতেই এই নামকরণ সংক্রান্ত কথাবার্তা হয়েছিল। পণ্ডিতজীর বইটি লেখার সময়েও মুন্সীজী বেঁচে ছিলেন। বিবরণটি নিম্নরূপ :—

"একথা বোধহয় খুব কম লোকই জানে যে স্বামীজীর সর্বজনবিদিত বিবেকানন্দ নাম রেখেছিলেন রাজাজী বাহাদুর। স্বামীজী নিজের নাম বিবিদিষানন্দ লিখতেন। এ কথা তাঁর পুরাতন পত্রাবলী থেকেও প্রমাণ হয়। খেতড়ীর প্রথম যাত্রায় স্বামীজী একদিন রাজাজীর কাছে বসে ছিলেন। তিনি (রাজাজী) হাসতে হাসতে বললেন—'মহারাজ আপনার নামটি বড়ই কঠিন। বিনা টীকায় সাধারণ লোকে এর মানে বুঝতে পারবে না। উচ্চারণ করাও সহজ নয়। তা ছাড়া এখন তো আপনার বিবিদিষা কাল ও (বিবিদিষা শব্দের অর্থ জানার ইচ্ছা) সমাপ্ত হয়েছে।'

স্বামীজী রাজাজীর যুক্তিযুক্ত পরামর্শ শুনে প্রশ্ন করলেন—আপনার কোন নাম পছন্দ ?

রাজাজী বললেন—আমার মনে হয় আপনার যোগ্য নাম হবে বিবেকানন্দ।

পরম অনুরক্ত রাজাজীর ইচ্ছা অনুসারে সেই দিন থেকে স্বামীজী নিজের নাম, বিবেকানন্দ, গ্রহণ করলেন এবং এই নামই ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন।"

স্বামীজীর জীবনীকারেরাও বলেছেন "আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেছিলেন খেতড়ীর মহারাজার অনুরোধে।"

শিক্ষিতজনের মধ্যেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুধারণা যদিও আছে তবু পণ্ডিত ঝাবরমলজীর পরিবেশিত তথ্যই প্রামাণ্য কারণ মুন্সী জনমোহনলালের জীবদ্দশায় এই গ্রন্থ লেখা হয়েছিল এবং এর ভূমিকা লিখেছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবিত কালে কোনও শিষ্যের সন্ন্যাসনাম দিয়ে যাননি। নরেনের নাম দিয়েছিলেন কমলাক্ষ, ভালবেসে। সে নাম থাকেনি। পরিব্রাজক নরেন্দ্র বরাহনগর ত্যাগ করে নাম নিয়েছিল সচ্চিদানন্দ। হয়ত আরও অন্য

নামও নিয়েছিল; তার বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে গণ্ডারের মত একাকী ভ্রমণ করার জন্য নামহীন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়েছিল। খেত্‌ড়ীতে নরেন্দ্র এসেছিলেন বিবিদিষানন্দ নামে। খেত্‌ড়ীতে পরিগ্রহণ করেছিলেন সেই নাম যা ঠাকুরের ভাষায় 'জগতের ভিত্‌ ধরে নাড়া দেবে'—বিবেকানন্দ।

খেত্‌ড়ী তথা রাজপুতানা স্বামীজীর ওপর শুধু নয় রামকৃষ্ণ মঠও মিশনের ওপরেও কিছু কিছু ছাপ রেখে গেছে।

মহারাজের পরামর্শেই স্বামীজী পাগড়ী পরা শুরু করেন। রাজপুতানা ছাড়ার পরেও পাগড়ী থেকে গিয়েছিল। আজ রামকৃষ্ণ মিশনের পবিত্র সন্ন্যাসবেশের অচ্ছেদ্য অঙ্গ এই পাগড়ী।

খেত্‌ড়ীতে পদার্পণের অব্যবহিত পূর্বে স্বামীজীর আলোয়ারবাসী বন্ধুদের অনুরোধে যে ছবিটি তোলা হয়েছিল জয়পুরে, তাতে স্বামীজীর পাগড়ি নেই।

বিবিদিষানন্দ যখন প্রথম খেত্‌ড়িতে আসেন তখন গ্রীষ্মকাল। রাজস্থানের অসহ্য 'লু', (গরম বাতাস) তখন পুরোদমে বইছে। স্বামীজী এই 'লু' কে বড় ভয় করতেন। রাজাজীর পুত্রের জন্মোৎসবে যোগ দেবার জন্য স্বামীজীকে যখন মাদ্রাজ থেকে খেত্‌ড়ী আসার জন্য মুন্সী জগমোহনলাল নিমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন তখন আমেরিকা যাত্রার চিন্তা ছাড়াও এই 'লু' এর চিন্তা স্বামীজীর কাছে বেশ বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল।

যা হোক্ রাজাজীর পরামর্শেই স্বামীজী পাগড়ী বাঁধা শুরু করেছিলেন। কি ভাবে রাজস্থানী কায়দায় পাগড়ী বাঁধতে হয় তাও রাজাজীই শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

খেত্‌ড়ীতেই স্বামীজী উচ্চমানের জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন সংস্কৃতে। তাঁর সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তির কথা সর্বজনবিদিত। খেত্‌ড়ী নরেশের সভাপণ্ডিত, পণ্ডিত নারায়ণদাসজীর কাছেই তিনি পাণিনিসূত্রের উপর পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁকে স্বামীজী সর্বদা 'গুরু' বলে অভিহিত করতেন।

এ ছাড়া রাজপুতানায় থাকার সময় যে জীবন স্বামীজী দেখেছিলেন তার যেটুকু ভাল তাঁর চোখে পড়েছিল, মনে দাগ কেটেছিল।

অনেক পরে ইংলণ্ড থেকে যখন স্বামীজী মঠের পরিচালন সম্বন্ধে গুরুভাইদের কাছে পত্র লিখতেন (অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই চিন্তাটা তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল) তখনও রাজপুতানার জীবনধারা তাঁকে প্রভাবিত করত।

সোমবার-২৭শে এপ্রিল-১৮৯৬ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি দীর্ঘ পত্র

লিখেছিলেন, মঠের পরিচালন সম্বন্ধে কেতার্শ্যাম, রিভিং, ইংলণ্ড থেকে। পত্রটি দীর্ঘ, এবং যে, কোনও সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ। কিন্তু রাজপুতানার জীবনধারা যে স্বামীজীকে তখনও প্রভাবিত করত শুধু সেইটুকু বোঝাবার জন্য নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করলাম :—

"৬। আহারের নির্দিষ্ট সময় যেন হয়। প্রত্যেকের বসিবার জন্য একটা আসন ও খাইবার জন্য একটা ছোট চৌকী (থাকিবে) আসনে ব'সে চৌকির উপর থালা রেখে খাবে—যে প্রকার রাজপুতানায়।"

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই রাজপুতানায়, খেতড়ীরাজগৃহে, নাচ ঘরে, এক নর্তকীর কাছ থেকে স্বামীজী পেয়েছিলেন সেই একমেবাদ্বিতীয়মের সংবাদ, সেই সর্বব্যাপ্তচরাচরম পরব্রহ্মের ঠিকানা, এবং স্বামীজী 'সাম্য-সম্বুদ্ধ' হয়েছিলেন, ভগবান বুদ্ধের মতো খেত্ড়ী স্বামীজীর 'বোধ-গয়া'।

আরও আশ্চর্য্য এ শিক্ষা হয়েছিল একজন নাচনেওয়ালী বাঈজীর কাছে। গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায়, কয়েকজন অন্তরঙ্গ মিত্রপরিবৃত হয়ে মহারাজ বসে আছেন বাগানে। সংলগ্ন নাচ ঘরে বাঈজী, কখনও বীণায় কখনও অন্য কোনও বাদ্যযন্ত্রে মৃদু ঝংকার তুলছে। মহারাজ নাচ ঘরে এলেন। জগমোহনলালকে পাঠালেন তাঁর গুরুকে ডেকে আনার জন্য। স্বামীজী এসে কিছুক্ষণ ধর্ম্মীয় কথাবার্তা বললেন, কিন্তু মহারাজ যখন বাঈজীকে গান গাইতে বললেন তখন স্বামীজী উঠতে চাইলেন। স্বামীজী কখনও স্ত্রীজাতি গানবাজনা করলে সেখানে বসে থাকতেন না। মহারাজ গুরুজীকে থামালেন। "স্বামীজী গানটি শুনে যান, এ গান আপনার মনে উচ্চভাবই জাগাবে"। শিষ্যের অনুরোধে স্বামীজী বসলেন।

সেই মন্দসমীর সন্ধ্যায় বাজনার তালে তালে সন্ত সুরদাসের ভজন ধরল সেই বাঈজী :—

প্রভু মোর, অসদ্গুণ চিতে না ধরো
সমদর্শী নাম তোমার, আজ মোরে পার করো প্রভু মোর· ·
এক লোহা প্রতিমার হাতে, সেই লোহা কসাইয়ের হাত
পরশপাথর পেয়ে দুই, হয়ে যায় কাঞ্চনপাত, প্রভু মোর···

২১। পত্রাবলী পত্র—২৮০।

এক বিন্দু বারি যমুনায়, সেই বারি নষ্ট-নালায়
গঙ্গাপরশ পেয়ে দুই, সুরসরি নামগুণ পায়, প্রভু মোর…
তাই প্রভু, অসদ্‌গুণ চিতে না ধরো
প্রভু আমার, সমদর্শী নাম তোমার
আমা-তোমা দুই, ব্রহ্মে লীন করো।

প্রভুমোর…

স্বামীজী স্বয়ং এই ভজনটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। আমি বঙ্গানুবাদ করার চেষ্টা করলাম।

স্বামীজী নিজে বলেছেন "এ গান শুনে মনে হল এই আমার সন্ন্যাস ? আমি সন্ন্যাসী, তবু এই স্ত্রীলোকে আর আমাতে আমি ভেদাভেদ দেখলাম ?" স্বামীজী যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হলেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্, সর্বব্যাপ্তচরাচরম্, সম্যক্ উপলব্ধি করলেন। সেইদিন থেকে এই বাঈজীকে স্বামীজী মা বলে ডাকতেন।

স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে, আমেরিকাযাত্রার পর আরও দীর্ঘায়িত অনুপস্থিতিতে, স্বামীজীর পরিবারের অভিভাবকত্ব শুধু নয়, প্রায় ভরণপোষণের দায়িত্বও মহামান্য রাজাজী মহারাজ নিয়েছিলেন। নিয়েছিলেন স্বীয় কর্ত্তব্যবোধে, গুরুচরণে সেবাব্রতে।

"কথা প্রসঙ্গে রাজা সাহেব জানিতে পারিলেন যে স্বামীজীর মাতা ও আত্মীয়েরা আছেন। তাঁহাদের সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য রাজা সাহেব উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন। শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয়কে রাজা সাহেব স্বামীজীর বাড়ির খবর পাঠাইতে একখানি পত্র লিখেন এবং তাহাতে এ কথা কাহাকেও প্রকাশ করিতে নিষেধ ছিল। তদবধি রাজা সাহেব স্বামীজীর মাতাকে প্রণামী স্বরূপ মাসিক ১০০্ টাকা জগমোহনলালের মারফৎ পাঠাইয়া দিতেন। রাজা সাহেব যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তিনি টাকা সমানভাবে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজা সাহেব তাঁহার পুত্রের উৎসব উপলক্ষ্যেও প্রণামীস্বরূপ স্বামীজীর মাতাকে ১০০্ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে স্বামীজী কথা প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন, রাখালকে তখন বল্লুম যে খেতড়ীর রাজা মঠে মাসিক ১০০্ টাকা দিতে রাজী হয়েছেন, নে না, রাখাল তখন ঘোর বৈরাগ্য দেখাতে লাগলো, নিলে না, কষ্টে মরতে লাগলো। তাই ত আমি রাখালের উপর চটে গেলুম।

রাজা সাহেব নরেন্দ্রনাথের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন, যে প্রতি মাসে তিনি দুইখানি করিয়া পত্র স্বহস্তে বর্তমান লেখককে (মহেন্দ্র দত্ত) লিখিতেন। রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলিয়া কোনও ভাব থাকিত না। কেবল তিনি যে স্বামীজীর অনুগত ভক্ত সেই ভাবটি পত্রে প্রকাশ পাইত। মুন্সী জগমোহন লালও নিজে আত্মীয়বোধে সর্বদাই পত্র লিখিতেন এবং প্রত্যেকের নাম করিয়া খবর লইতেন।"[২২] প্রত্যেকের নাম করে খবর নেওয়া থেকেই বোঝা যায় রাজাজী কি চোখে তাঁদের দেখতেন।

যদিও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাঁর পরিবারের কারও মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না তবু মা-ভাইবোনদের জন্য দুশ্চিন্তা তাঁর সবসময়ই লেগে থাকত। মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে তিনি তা প্রকাশও করেছেন।

৪ঠা জুলাই—১৮৮৯ বাবু প্রমদাদাস মিত্রকে লিখছেন:—"আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্ষ্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট, ইঁহাদের অবস্থা পূর্ব্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখনও কখনও উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল; হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটির অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।"

২৯শে জানুয়ারী ১৮৯৪ শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখছেন:—

"আপনি আমার দুঃখিনী মা ও ছোট ভাইদের দেখিতে গিয়াছিলেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু আপনি আমার একমাত্র কোমল স্থানটি স্পর্শ করিয়াছেন। আপনার জানা উচিত যে আমি নিষ্ঠুর পশু নই। এই বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি আমার মা। তথাপি এ বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং এখনও করি যে, যদি আমি সংসার ত্যাগ না করিতাম তবে আমার মহান গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না।"

২২। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—২য় খণ্ড
পৃঃ—১৪৫-১৪৬

১০ই জানুয়ারী ১৯০০ ধীরামাতা (মিসেস ওলি বুলকে) লিখেছেন:—"কিছুদিনের জন্য আমার মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে। আমার জন্য তিনি অনেক কষ্ট করেছেন। তাঁর শেষের দিনগুলিতে যদি একটু শান্তি এনে দিতে পারি। তুমি কি জান? স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যকে একাজ করতে হয়েছিল?"

২৭শে ডিসেম্বর—১৯০০ ধীরামাতাকেই লিখছেন। "রাজযোগ বাবদ এবং খেতড়ীর মহারাজার নিকট পাওয়া পাঁচশো পাউণ্ডের কিছু বেশী অর্থ মিঃ লেগেটের কাছে আছে। মিঃ লেগেটের কাছে এখন আমার প্রায় এক হাজার ডলারের মত হল। যদি আমি মারা যাই এ টাকা আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিও।"

৬ই মার্চ—১৯০০ ধীরামাতাকেই লিখছেন:—"আমার মায়ের শেষ দিন কটির জন্য তাঁর কাছে ফিরে যাব। নিউ ইয়র্কে আমার যে এক হাজার ডলার আছে তা থেকে মাসে নয় টাকা পাওয়া যাবে, এ ছাড়া এক টুকরো জমি মায়ের জন্য কিনব। এ থেকে ছয় টাকা এবং তাঁর পুরান বাড়ীটি থেকে, ধর—ছয় টাকা আমি, মা, ঠাকুমা আর আমার ভাই, মাসিক কুড়ি টাকায় মনে হয় ভালই থাকব।"

উল্লেখ না করে পারছি না যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে, স্বামীজীর মনের এই দিকটিতে আলোকপাত করে এমন পত্রগুলি অথবা সেগুলির অংশবিশেষ বাংলায় প্রকাশিত পত্রাবলী থেকে সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে।

যদিও তার বিশেষ কারণ ছিল বলে মনে হয় না। গোঁড়া অর্থে পিতামহ দুর্গাচরণের মত সাধু স্বামীজী ছিলেন না।

দুর্গাচরণ সন্ন্যাসী হওয়ার পর কাশীতে আপন ভগিনীকে চিনতে পেরেও 'মায়া হায়, এ মায়া হায়'—বলে চলে গিয়েছিলেন।

স্বামীজীর মনে কিন্তু মা, ভাই, বোনেদের জন্য কিছু করতে না পারার দুঃখ ছিল, এবং মাঝে মাঝেই তাঁকে বিমর্ষ করত। তবে, স্বামীজী যখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বিরাট সত্যকে প্রকাশিত করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন তখন কিন্তু তাঁর, বন্ধু—দার্শনিক এবং দিগদর্শন—রাজাজী মহারাজ, স্বামীজীর পূর্বাশ্রম জীবনের অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক।

রাজাজী মহারাজ এবং মুন্সী জগমোহনলালের মত বিচক্ষন, সংসারাভিজ্ঞ, মানুষ যে স্বামীজীর 'পূর্বাশ্রম' সম্বন্ধে খোঁজখবর নেননি এরকম মনে হয় না।

ওয়াক্যত রেজিষ্টারে লিখিত স্বামীজীর সাক্ষাৎকারে, শুধু যে দর্শন এবং ধর্মালোচনাই প্রাধান্য পেয়েছিল তাই নয়, স্বামীজীর 'পূর্বাশ্রম' জীবনের কথাও, বিচক্ষণ রাজাজী জেনে নিয়েছিলেন।

নিকটাত্মীয়দের আর্থিক অনটনের কথা ভেবে দুশ্চিন্তাভারাক্রান্ত মন নিয়ে স্বামীজী আমেরিকা যাত্রা করুন, রাজাজী তা চাননি।

অন্যদিকে, স্বামীজীরও মহারাজের কাছ থেকে সাহায্য নিতে বা স্পষ্টভাবে সাহায্য চাইতে কোনও দ্বিধা বা কুণ্ঠা ছিল না।

স্বামীজী রাজাজী সম্পর্ক শুধু যে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক তাই নয়, 'রাজদ্বারে শ্মশানেচ'—বন্ধুর সম্পর্ক, প্রায় সহোদর ভাইয়ের সম্পর্ক।

এই মধুর সম্পর্কটি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, রাজাজী এবং মুন্সীজীর সঙ্গে স্বামীজীর এবং তাঁর পরিবারের অনেকগুলি পত্রালাপে। পত্রগুলি মর্মস্পর্শী। কয়েকটি পত্র। পত্রাংশ উদ্ধৃত করলাম।

২রা জুন—১৮৯৩—মহারাজকে লিখেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত—"৩১শে মে তারিখে আপনার চিঠি পেয়েছি এবং একশত টাকার কারেন্সী নোটের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্তি স্বীকার করছি। আপনার চিঠির কথা আমি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে, আমার মাকে ও ঠাকুমাকে জানিয়েছি।"

উল্লেখ্য, এ চিঠি স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার মাত্র দু'দিন পর লেখা।

১৩ই জুন—১৮৯৩—মহারাজকে লিখেছেন মহেন্দ্রনাথ—"আপনার চিঠি এবং একশত টাকার কারেন্সী নোটের অর্দ্ধাংশ পেয়েছি। আপনার শিশুপুত্রের রোগারোগ্যের সংবাদ পেয়ে আমার মা এবং ঠাকুমা হর্ষ এবং বিষাদ প্রকাশ করেছেন।"

১৩ই জুন—১৮৯৩—মহারাজকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী লিখেছেন—

"মহামান্য,

আমার অসুস্থতার বিষয়ে খবরাখবর নেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

মহেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভাল ছেলে এবং সে নিঃস্বার্থভাবে আমার সেবা করেছে।

আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি, এই দেখে, যে আপনি স্বামী বিবেকানন্দের পরিবারের জন্য এত চিন্তা করেন। ভারত ত্যাগ করার আগে বিবেকানন্দজী আপনার সম্বন্ধে আমার কাছে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আপনার মত মহাত্মা যখন তাঁর পরিবারের দুর্দশা দূর করার জন্য সদা সচেষ্ট তখন আমার স্থির বিশ্বাস

যে তাদের দুঃখের রাত্রি শীঘ্রই অবসান হবে।

শুনে সুখী হলাম যে আপনার শিশুপুত্র আরোগ্যলাভ করেছে।

আমি ভাল আছি। আশা করি আপনি এবং রাজকুমার ভাল আছেন।

মহামান্যের জন্য প্রার্থনা এবং আশীর্ব্বাদান্তে।

রামকৃষ্ণানন্দ

পুনশ্চঃ মহেন্দ্রনাথ আপনার প্রেরিত একশত টাকার নোটের অর্দ্ধাংশ পেয়েছে। সে তার, মা এবং পরিবারের সকলে ভাল আছে।

২০শে জুলাই—১৮৯৩—মহারাজকে স্বামী শিবানন্দ (যিনি পরে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন) লিখেছেন—

"প্রিয় রাজা সাহেব,

ব্যক্তিগতভাবে যদিও আমি আপনাকে চিনি না তবুও মনে করি, আপনাকে চিঠি লেখার অধিকার আমার আছে, কারণ বিবেকানন্দ আমার একজন গুরু ভাই (অত্যন্ত উচ্চ ভূমির)।

আপনার কথা আমি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কাছে জেনেছি। খেতড়ীতে তিনি আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন গত বছরের আগের বছর।

বিবেকানন্দের লেখা চিঠিপত্রেও আপনার খবর পাই। আমি যখন মঠে ছিলাম তখন পূর্বাশ্রমে বিবেকানন্দের পরিবারের খবরাখবর জানতে চেয়ে আপনার লেখা চিঠি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আপনার হৃদয়ের ঔদার্য্যের এই পরিচয় পেয়ে আপনার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা আমার হয়েছে। আগামী শীতে আমি যখন রাজপূতানা যাব তখন হয়ত দেখা হতে পারে।······

আপনার শুভাকাঙ্খী,

শিবানন্দ

৬ই জুলাই—১৮৯৩—মহেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখেছেন মুন্সী জগমোহনলাল—

"মহাশয়,

আপনি হয়ত ভেবে অবাক হবেন যে আমি কেন আপনাকে চিঠি লিখছি, কিন্তু প্রথমেই জানাই যে আমি মহামান্য মহারাজ (খেতড়ীর) কর্মচারী। মহামান্য আমাকে বিশ্বাস করে আপনার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত করিয়েছেন।

ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে পত্রালাপ হবে। কিন্তু, ভুল বোঝাবুঝির কোনও

সুযোগ না থাকে, সেইজন্য এই প্রথম পত্রটি আমি মহামান্যকে দিয়ে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করিয়ে নিলাম।

অনুমত্যানুসারে আমি এই পত্রের সঙ্গে একশত টাকার কারেন্সী নোট নং-V/41, 62743 এর প্রথম অর্দ্ধাংশ পাঠাচ্ছি, আপনার পরিবারের ব্যয়-সংকুলানে সাহায্য বাবদ এবং প্রাপ্তি সংবাদ পাওয়ার পর অপর অর্দ্ধাংশ পাঠিয়ে বাধিত হব।

বোম্বাই ত্যাগ করার পর স্বামী বিবেকানন্দের জাহাজ ভালভাবেই চিকাগোর দিকে চলেছে। মহামান্য তাঁর কাছ থেকে দুটি চিঠি পেয়েছেন, একটি কলম্বো থেকে অপরটি পেনাং থেকে। দুটি চিঠিই 'পেনিনসুলা' জাহাজ থেকে লেখা।

মহামান্য রাজকুমার এবং অন্যান্য সকলে ভাল আছেন।

শুভেচ্ছান্তে,

জগমোহনলাল

৩১শে জুলাই ১৮৯৩ মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন জগমোহনলালকে—

"...... স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে আপনি জানতে চেয়েছিলেন আমার পড়াশুনা কেমন চলছে। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি এ পর্য্যন্ত আমি ভালই করেছি এবং অধ্যাপকগণ আমার অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট......" [মহেন্দ্রনাথ দত্ত]

পুনশ্চ! একশত টাকার নোটের অর্দ্ধাংশ পেয়েছি কিন্তু ভবিষ্যতে যদি টাকা পাঠান রেজেষ্ট্রী করে পাঠাবেন কারণ পোষ্ট অফিসের লোকেরা সন্দেহ করেছে এবং আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে যে তারা চিঠি খুলে কারেন্সী নোট নিয়ে নিতেও পারে।

এবার স্বামীজীর লেখনীতে দেখা যাক।

২২শে নভেম্বর ১৮৯৮ বেলুড় মঠ থেকে স্বামীজী লিখছেন মহারাজকে—

"আজ আপনাকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তিগত বিষয়ে লিখছি; লিখছি কারণ আমি জানি আপনার কাছে আমার মনের কথা খুলে, বলতে বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। এ জীবনে আপনাকেই একমাত্র বন্ধু বলে জানি। নীচে যা লিখছি তা যদি আপনার মনঃপূত হয় ভাল, না হলে, এই বোকামি ক্ষমা করবেন যেমন একজন বন্ধু করে থাকে।

আপনি জানেন ফিরে আসার পর থেকে আমি শুধুই ভুগছি। কলকাতায়

আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে আপনার বন্ধুত্ব এবং সাহায্য আমি পাব। অনুরোধ করেছিলেন যেন এই দুরারোগ্য ব্যাধি সম্বন্ধে চিন্তা না করি।

স্নায়বিক উত্তেজনা থেকেই এই ব্যাধির সৃষ্টি এবং স্থানপরিবর্ত্তনে এর কোনও প্রতিকার হবে না। শুধু দুশ্চিন্তা এবং উত্তেজনার প্রশমনেই একমাত্র উপকার হবে পারে।

গত দু বছর ধরে বিভিন্ন আবহাওয়ায় থেকে আমি দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছি এবং এখন প্রায় মৃত্যুর দ্বারদেশে। আমি আপনার প্রতিশ্রুতি, উদারতা এবং বন্ধুত্বের কাছে আপীল জানাচ্ছি।

একটিমাত্র পাপ আমার বুকটাকে কুরে খাচ্ছে, তা হল জগতে জন্য কিছু করার তৃষ্ণা। আমার মাকে আমি ভীষণভাবে অবহেলা করেছি। আমার ভাই (মহেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা করেন) চলে যাওয়ার পর তিনি বিষাদে ভেঙ্গে পড়েছেন। আমার শেষ ইচ্ছা, যে শেষ কয়েক বছর মায়ের সেবা করি। মায়ের সঙ্গে আমি থাকতে চাই এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিয়ে বংশরক্ষার ব্যবস্থা করতে চাই। আমার এবং আমার মায়ের শেষজীবনে এতে শান্তি আসবে। মা এখন একটি পোড়োবাড়ীতে বাস করছেন। তাঁর জন্য একটি ছোট বাড়ী তৈরী করে, ছোট ভাইটির একটি ব্যবস্থা করতে চাই কারণ তার ক্ষেত্রে ভাল রোজগারের আশা নাই।

আপনি রামচন্দ্রের বংশধর, যাকে ভালবাসেন এবং বন্ধু বলে জানেন, তার জন্য এটুকু করা কি আপনার পক্ষে অত্যধিক ? আপনি ছাড়া অন্য কাকে ধরব আমি জানি না। ইউরোপে যা টাকা পাওয়া গিয়েছিল তা কাজের জন্য এবং সে জন্যই প্রতি কপর্দ্দক খরচা হয়ে গেছে।

নিজের জন্য অন্য কারও কাছে ভিক্ষা করতে পারি না। আমার পরিবারের কথা একমাত্র আপনার কাছেই খুলে বলেছি এবং অন্য কেউ সে কথা জানবে না।

আমি ক্লান্ত, দুঃস্থচিত্ত এবং মৃতপ্রায়—আপনি মহানুভব, অতীতে অসংখ্য দয়া আপনি আমাকে করেছেন। প্রার্থনা করছি শেষবারের মত এই দয়াটুকু আপনি করুন। তাতে আমার শেষের দিনগুলি সহজ হবে এবং তিনি, যাঁকে

আমি সারা জীবন সেবা করার চেষ্টা করেছি, আপনাকে এবং আপনার স্বজনবর্গকে আশীর্ব্বাদ করবেন।

প্রভুর পাদপদ্মে সদাই আপনার—

বিবেকানন্দ

পুনঃ বিষয়টি একান্ত গোপনীয়। আপনি এ কাজ করবেন কিনা একটি তার করে জানাবেন কি ?

খেত্‌ড়ী মহারাজের উত্তর ইতিবাচকই ছিল কারণ—

১লা ডিসেম্বর ১৮৯৮ বেলুড় মঠ থেকে আবার স্বামীজী লিখছেন—

মহারাজ, আপনার টেলিগ্রাম আমাকে যে কি খুশী করেছে, বর্ণনা করতে পারব না। আপনার মত মহানুভব ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য এটাই যথার্থ। আমার প্রয়োজন সবিস্তারে বলছি।

কলকাতায় একটি ছোট বাড়ী তৈরী করতে কম করেও দশ হাজার টাকা লাগবে। চার পাঁচজনের থাকার মত একটি বাড়ী কিনতে বা তৈরী করতে ঐ টাকা লাগবে। তাও শহরের উপকণ্ঠে।

এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যায়নির্বাহ করতে আপনি যে মাসিক একশত টাকা আমার মাকে পাঠান তাঁর পক্ষে তাই যথেষ্ট।

আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত, আমার ব্যয়নির্বাহের জন্য, মাসে মাসে যদি আরও একশত টাকা আপনি পাঠাতে পারেন, কারণ অসুস্থতাবশতঃ আমার খরচ কিছু বেড়ে গেছে, তা হলে খুশী হব। তবে বেশীদিন এ ভার আপনাকে বইতে হবে না কারণ আমি বড় জোর আর কয়েক বছর মাত্র বাঁচার আশা রাখি।

আর একটি ভিক্ষা আপনার কাছে করব। আমার মাকে যে একশত টাকা আপনি পাঠাচ্ছেন সেটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিন। যাতে আমার মৃত্যুর পরেও তিনি এ টাকা নিয়মিত পেতে পারেন। আমার উপর আপনার দয়া এবং প্রীতি যদি কখনও বন্ধও হয়ে যায় আমার দুঃখিনী মা যেন আপনার দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত না হয়।

এই গরীব সাধুর প্রতি কখনও যে ভালবাসা দেখিয়েছিলেন সে কথা মনে রেখে আশা করি এটুকু করবেন।

এ পর্য্যন্ত আমার জন্য আপনি অনেক করেছেন, এই ছোট কাজটুকু

করুন। আমি জানি আর কিছু প্রমাণ করা যাক্ বা না যাক্ কর্মের শক্তি স্বতঃসিদ্ধ। এই সৎকর্ম্মের আশীর্ব্বাদ আপনার এবং আপনার স্বজনবর্গের উপর সর্বদা বর্ষিত হবে।

আর আমার কথা? কি আর বলব? জগতে আমি যেটুকু হতে পেরেছি প্রায় সবটুকুই তো আপনারই সহায়তায়। কী ভীষণ দুশ্চিন্তার গুরুভার আমার মাথা হতে সরিয়ে নিয়ে আপনি আমাকে জগতের মুখোমুখি দাঁড করিয়েছিলেন, কর্ম্ম করতে সাহায্য করেছিলেন।

কে জানে প্রভুর হয়ত আবার ইচ্ছা যে আপনি আমার বর্ত্তমান দুশ্চিন্তাটির বোঝা লাঘব করুন এবং হয়ত আরও বড় কাজ করা যাবে।

তবে এ কাজ আপনি করুন বা না করুন ভালবাসার পাত্র চিরকালই ভালবাসার পাত্র। ইতিপূর্ব্বেই আপনার কাছে অনেক ঋণ আমার হয়েছে। আমার স্নেহ এবং আশীর্ব্বাদ আপনার এবং আপনার আপনজনের উপর চিরকাল বর্ষিত হবে। মঙ্গলময়ী মা, এ সংসার যাঁর লীলাখেলা, যাঁর হাতে আমরা নিমিত্তমাত্র, তিনি আপনাকে সর্ব্বকলুষ থেকে রক্ষা করুন।

প্রভুপাদে চিরতরে আপনার—

বিবেকানন্দ

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ কাশ্মীর থেকে মহারাজকে বিবেকানন্দ লিখেছেন—

"এখানে আমি দু সপ্তাহ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি।

আমার কিছু টাকার টান পড়েছে। যদিও আমেরিকান বন্ধুরা আমাকে সাহায্যের জন্য তাঁদের সাধ্যমত সব কিছুই করেছেন, কিন্তু সব সময়ই তাঁদের কাছে হাত পাততে সঙ্কোচ হয়; অসুখ করলে খরচের বহর অনেক বেড়ে যায়।

এই জগতে শুধু একজনের কাছেই আমার কিছু চাইতে লজ্জা হয় না, এবং তিনি হলেন আপনি। আপনি দিলেন কি না দিলেন—আমার কাছে দুইই সমান। যদি সম্ভব হয় অনুগ্রহ করে কিছু টাকা পাঠাবেন। আপনি কেমন আছেন? অক্টোবরের মাঝামাঝি আমি নামছি।

জগমোহনের কাছ থেকে কুমার সাহেবের সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার খবর পেয়ে আনন্দ পেলাম।

আমার খবর ভাল, আশা করি আপনারাও কুশল

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

মহারাজা অজিত সিং বিবেকানন্দের পূরক-অস্তিত্ব। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবন-নাটক পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিভিন্ন চরিত্রের পূরক-পরিপূরক ভূমিকাগুলি পূর্বনির্ধারিত।

জগমোহনলালকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী নিজেই বলেছেন, "আমি তাঁকে (রাজা) অনেকদিন আগেই বলেছিলাম যে তিনি এবং আমি জন্মগ্রহণ করেছি মহান কর্ম করার জন্য।

কোনও কোনও মানুষ কোনও বিশেষ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন কোনও বিশেষ কর্ম মিলিতভাবে করার জন্য। অজিত সিং এবং আমি, দুটি পৃথক আত্মা, জগতের হিতকল্পে বিরাট কর্ম করার ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য জন্মেছি। আমি তাঁকে ভাল না বেসে পারি না। এটা পূর্ব্বজন্মের ব্যাপার। আমরা যেন পূরক এবং সম্পূরক।"

জয়পুরের মহারাজা মাধো সিংজীর সঙ্গে যখন মহারাজ অজিত সিং এর বিবাদ হয়, এবং যখন তাঁকে গদীচ্যুত করার চক্রান্ত হয় তখন স্বামীজী লিখেছেন—"পৃথিবীতে কার ক্ষমতা আছে খেতড়ীর রাজাকে দাবিয়ে রাখে? জগজ্জননী সর্বদা তার সঙ্গে আছে।"

ঠাকুর নরেনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন "মা, বলে দিয়েছেন, তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না কোনওদিন।"

হয়নি, কারন মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, স্বামীজীর মহারাজ-শিষ্য, নরোত্তম-নরেশ, অজিত সিংজী।

নরেন্দ্রনাথ যখন স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে জগৎ জুড়ে প্রভুর কর্ম করে বেড়াচ্ছেনতখন ব্যক্তি-নরেনের আরব্ধ কর্ম প্রভুই করিয়ে দিয়েছিলেন আবু পর্বতে মহারাজা অজিত সিং এর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটিয়ে।

□ বিবেকানন্দ □

ভারবাসীর তথা জগতবাসীর হিতকল্পে পাশ্চাত্যযাত্রার ইচ্ছার ভ্রূণ সঞ্চার ঠিক কবে স্বামীজীর মনে হয়েছিল তা সঠিক বলা সম্ভব নয়।

তবে এ বিষয়ে প্রেরণা তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রথম পান গাজীপুরে ১৮৯০ সালে জেলা জজ মিঃ পেরিংটনের কাছ থেকে। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং অন্তর্দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে মিঃ পেরিংটন বলেছিলেন তাঁকে ইংলণ্ডে গিয়ে তাঁর ভাবধারা প্রচার করতে।

১৮৯২ নাগাদ পোরবন্দরের দেওয়ান পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ তাঁকে বলেছিলেন—"স্বামীজী এদেশে থেকে মনে হয় না আপনি বিশেষ কিছু করে উঠতে পারবেন। খুব কম লোকই এখানে আপনাকে বুঝবে। আপনার পাশ্চাত্যে যাওয়া উচিত। সেখানে লোকে আপনাকে বুঝবে এবং আপনার যোগ্যতার স্বীকৃতি দেবে। সনাতন ধর্ম প্রচার করে সেখানে আপনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপর বিপুল আলোকসম্পাত করতে পারবেন।"

স্বামীজী নিজে এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন খাণ্ডোয়ায়, ১৮৯২ সালেই, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। 'কেউ যদি আমার যাতায়াতের খরচা দেয় তো আমি যেতে প্রস্তুত।'

১৮৯২ সালেই বেলগাঁওয়ের ফরেষ্ট অফিসার শ্রীহরিপদ মিত্রের কাছে তিনি চিকাগোয় ধর্মমহাসভায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীমিত্র তৎক্ষণাৎ যাতায়াতের খরচের জন্য চাঁদা তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু স্বামীজী রাজী হননি।

তরপর ১৮৯২ সালেই বাঙ্গালোরে; মহীশূরের মহারাজাকে স্বামীজী তাঁর আমেরিকা যাত্রার অভিপ্রণয়ের কথা জানান। গুণমুগ্ধ মহারাজা তৎক্ষণাৎ অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব করেন। কোনও অজ্ঞাত কারণে স্বামীজী এবারও রাজী হননি।

ঐ ১৮৯২ সালেই মাদুরাইতে রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে

তাঁর পরিচয় হয়। তিনিও মহীশূরের মহারাজার মতই স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার ব্যয়ভার বহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু এবারও স্বামীজী রাজী হলেন না। তবে রামেশ্বর দর্শন করার পর তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন, বলে গেলেন।

১৮৯২ এর শেষভাগে স্বামীজী এ ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন রামেশ্বর দর্শনান্তে কন্যাকুমারিকায়। সমুদ্রশিলার উপরে ধ্যানলীন স্বামীজী আবিষ্কার করলেন ভারতাত্মার প্রকৃত স্বরূপ। সেই সঙ্গে এই সংকল্পও তাঁর মনে দৃঢ়তর হল।

১৮৯৩ এর শুরুতে মাদ্রাজে পৌছে স্বামীজী তাঁর প্রতিভায় অবিলম্বে বহু শিক্ষিত যুবককে আকৃষ্ট করলেন। তাঁদের কাছে চিকাগো যাওয়ার অভিপ্রায় জানালে তাঁরা মহোৎসাহে পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করে ফেললেন। এ টাকা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই ছিল।

শিষ্যদের স্বামীজী বললেন এ ব্যাপারে মা এর অনুমতি আছে কি না তা তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান। পাঁচশত টাকা স্বামীজীর ইচ্ছায় দরিদ্র নারায়ণের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হল।

এরপর হায়দ্রাবাদ। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় হয়; প্রধানমন্ত্রী আশায় জা, কে, সি, এস, আই, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর; পেস্কার, মহারাজা শেওরাজ বাহাদুর, এবং বেগম বাহারের প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক মালিক শেঠ মোতীলালের সঙ্গে। এঁরা প্রত্যেকেই স্বামীজীকে যাতায়াত বাবদ অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

পাশ্চাত্যযাত্রার চিন্তায় স্বামীজী এতই বিচলিত ছিলেন, এ সময় যে, তিনি আফগানিস্থান এবং ইরাক হয়ে পদব্রজে আমেরিকা যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। হায়দ্রাবাদেই মেহবুব কলেজে স্বামীজী প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় তাঁর পাশ্চাত্য গমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

তারপর স্বামীজী মাদ্রাজে ফেরেন।

১৮৯৩ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্যগণ আক্ষরিক অর্থে দ্বারে দ্বারে গিয়ে স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ করতে শুরু করেন। এই শিষ্যদলের নেতা ছিলেন তরুণ শিক্ষক আলাসিঙ্গা পেরুমল, "যিনি আক্ষরিকভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছিলেন।" শুধু মাদ্রাজে নয়,

অনুরক্ত এই ভক্তবৃন্দ মহীশূর, রামনাদ এবং হায়দ্রাবাদেও গিয়েছিলেন অর্থ সংগ্রহের জন্য। স্বামীজীর এই মাদ্রাজী শিষ্যদের অনুরাগ, ভক্তি এবং স্বামীজীর কারণে আত্মোৎসর্গ ছিল সামগ্রিক, সার্বিক। স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার স্বপ্নটি সফল করার জন্য পেরুমল এবং সতীর্থদের পক্ষে যতদূর করা সম্ভব করার জন্য তাঁরা ছিলেন উদগ্রীব।

শিষ্যদের স্বামীজী বলেছিলেন "মায়ের যদি এই ইচ্ছে হয় যে আমি যাব তাহলে জনসাধারণের কাছ থেকেই সেই অর্থ আসুক। কারণ আমি পাশ্চাত্যে যাচ্ছি ভারতের জনসাধারনের জন্য, দরিদ্র জনসাধারনের জন্য।"

তাই তাঁর মাদ্রাজী শিষ্যরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকেই অর্থ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল কারণ ভারতের জনসাধারণ বলতে ঠিক যা বোঝায় তারা কিছু দেবার মত অবস্থায় তখনও ছিল না এখনও নেই।

আমেরিকায় যাওয়া সত্যি সত্যিই মায়ের ইচ্ছা কিনা এই চিন্তা স্বামীজীকে যথেষ্ট বিব্রত করেছিল। এই দুশ্চিন্তার বহিঃপ্রকাশও ছিল। এ সন্দেহের নিরসন হয়েছিল দুটি ঘটনায়।

মায়ের আদেশ, তাঁর গুরুর আদেশ, পাওয়ার জন্য যখন স্বামীজী নিরন্তর প্রার্থনা করে চলেছেন তখন একদিন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখলেন গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রের জলরাশির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন।

শ্রীশ্রী মায়ের কাছেও স্বামীজী অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁর আশীর্ব্বাদ পেয়েও স্বামীজী ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছিলেন।

এই ইতিকর্ত্তব্য সম্পাদনে চিকাগো যাত্রায়, 'নরেন জগতের ভিত ধরে নাড়া দেবে,' ঠাকুরের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে আবারও খেতড়ীর মহারাজা অজিত সিং-এর ভূমিকা যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। অন্তত স্বামীজীর ভারতীয় জীবনীকারদের বিশ্লেষণে।

একমাত্র রোমা রোলাঁ তাঁর 'বিবেকানন্দের জীবনী' গ্রন্থে বলেছেন, "তিনি খেতড়ীতে গেলেন এবং তাঁর বন্ধু মহারাজা, নিজের দেওয়ানকে সঙ্গে দিয়ে তাঁকে বম্বে পাঠিয়ে দিলেন যেখান থেকে তিনি জাহাজে উঠলেন।"

"যদিও খেতড়ীর মহারাজা তাঁর জন্য জাহাজের টিকিট কিনেছিলেন তবু স্বামীজীর আপত্তি সত্বেও তাঁকে একটি সুন্দর পরিচ্ছদ দিয়েছিলেন যে

পোষাক তাঁর আমেরিকার শ্রোতৃবর্গকে তাঁর বক্তৃতার চেয়ে কম চমৎকৃত করেনি।"

স্বামীজীর ইংরাজী জীবনীকারেরা বলেছেন—"এই মাদ্রাজেই অসংখ্য যুবক তাঁর অনুরক্ত শিষ্য হয়েছিল। এখানেই তিনি আমেরিকা যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাদি পেয়েছিলেন। এই মাদ্রাজেই তাঁর গুরুদেবের বাণী সাদরে গৃহীত হয়েছিল। এখানেই প্রথম তাঁর সংগঠন এবং প্রকাশনার কাজ আরম্ভ হয়েছিল এবং তাঁর মাদ্রাজী শিষ্যরাই তাঁর বাণী প্রচার করেছিল তাঁর পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের আগেই।"

জীবনীকারেরা পরে আবার বলেছেন—"কিন্তু সমুদ্র যাত্রার সব আয়োজন যখন সম্পূর্ণ তখন মুন্সী জগমোহনলাল, খেতড়ীর মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী দৃশ্যপটে অবতীর্ণ হলেন এবং সমস্ত পরিকল্পনা সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দিলেন।"

জীবনীকারেরা দুটি মতই ব্যক্ত করেছেন। এক, স্বামীজী মাদ্রাজেই প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়েছিলেন। দুই, খেতড়ীর মহারাজাই স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে। আমেরিকা যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সবটুকু কার কাছ থেকে এসেছিল এইটি প্রশ্ন।

সাধারণভাবে ধারণা হল স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্যগণ এবং মহীশূর ও রামনাদের মহারাজা প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়েছিলেন।

কিন্তু স্বামীজীর জীবনীকারেরা বলেছেন খেতড়ীর মহারাজা শুধু জাহাজের টিকিট কেটে দিয়েছিলেম তাই নয়—"খেত্‌ড়ীর মহারাজা, জগমোহনলালকে নির্দেশ দিয়েছিলেম স্বামীজীর সবরকম সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করতে। তাই স্বামীজীকে উপযুক্ত পরিচ্ছদ দেওয়া হল, রাহাখরচ বাবদ যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হল এবং 'পেনিনসুলার এবং ওরিয়েণ্ট কোম্পানীর স্টীমার, পেনিনসুলা তে একটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে দেওয়া হল।"

আরও—"বোম্বাইয়ের পথে জয়পুর ছেড়ে স্বামীজী চললেন। সঙ্গে রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাঁর উপর নির্দেশ ছিল সমস্ত ব্যায় ভার বহন করার এবং আমেরিকা যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করার। মহারাজা অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে স্বামীজীকে বিদায় জানালেন। এই মহারাজার সভাতেই,

তাঁরই অনুরোধে স্বামীজী বিবেকানন্দ নাম নিয়েছিলেন। তৎপূর্ব্বে বিভিন্ন নামে তিনি ভ্রমণ করেছেন, সচ্চিদানন্দ, বিবিদিষানন্দ, ইত্যাদি।"

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী'তে লিখছেন—

"স্বামীজী রাজপুতানা পরিদর্শন করিয়া গুজরাটের দিকে চলিয়া যান এবং তথা হইতে পুনা, বেলগাঁও হইয়া মাদ্রাজের দিকে যান। এদিকে রাজা অজিত সিং এর একটি পুত্র সন্তান হইল এবং সন্তানটির নামকরণ বা শুভকার্যের জন্য রাজা সাহেব স্বামীজীর বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে, রাজা সাহেব, মুন্‌সী জগমোহনলালকে স্বামীজীর অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন, মুন্‌সীজী অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে স্বামীজী মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছেন। মুনসীজী মাদ্রাজে গিয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং খেতড়ি রাজ্যে পুনরায় তাঁহাকে একবার যাইবার জন্য অনেক অনুনয় করিতে লাগিলেন। স্বামীজী মুনসীজীর সহিত খেতড়ীতে ফিরিয়া আসেন বা আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠান বর্তমান লেখকের তাহা মনে নাই।"

"স্বামীজী আমেরিকা যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন এই খবর শুনিয়া রাজা সাহেব মুন্‌সী জগমোহনলালের সঙ্গে টাকা দিয়া তাঁহাকে স্বামীজীর নিকট মাদ্রাজে পাঠাইয়া দেন। মুন্‌সী জগমোহনলাল স্বামীজীর সহিত বোম্বাইয়ে আসিয়া তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দেন। মুন্‌সী জগমোহনলাল স্বামীজীর সঙ্গে টাকা দেন বা পরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা বর্তমান লেখকের জানা নাই।"

শ্রীযুক্ত বেণীশঙ্কর শর্মা তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'বিবেকানন্দ, তাঁর জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায়' লিখেছেন অপ্রকাশিত তথ্য এবং পত্রগুচ্ছের ভিত্তিতে। তিনি দাবী করেছেন স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার ব্যাপারে সর্বাধিক সাহায্য করেছিলেন খেতড়ীর মহারাজা এবং মাদ্রাজ থেকে স্বামীজী সামান্যই সাহায্য পেয়েছিলেন।

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'তেও বিচার বিশ্লেষণের পর অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

তিনি বলেছেন, "সবদিক বিবেচনা করে আমাদের ধারণা হয়েছে, বেণীশঙ্কর যতখানি দাবী করেছেন তা পুরোপুরি না হলেও বহুলাংশে ঠিক। এমন ধারণায়

যুলে কেবল শর্মাজীর আবিষ্কৃত তথ্যই নই, স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর সাক্ষ্যও রয়েছে। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শিষ্যদের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছিল; সুতরাং তার সাক্ষ্যকে নিশ্চয় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না"

দক্ষিণী মহারাজগণ এবং মাদ্রাজী শিষ্যদের সংগৃহীত অর্থে যে স্বামীজীকে হতাশ হতে হয়েছিল তার উল্লেখ পাই স্বামীজীর স্বলিখিত পত্রে—

খাতাবাদ হায়দ্রাবাদ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ আলাসিঙ্গাকে লিখছেন—

"তাই আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল। আর এই জন্যই আমি গোড়াতেই মাদ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। সে ক্ষেত্রে আমায় আমেরিকা পাঠাবার জন্য আর্যাবর্তের কোনও রাজাকে ধরবার যথেষ্ট সময় হাতে পেতাম। কিন্তু হায় এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রথমতঃ এই গরমে আমি ঘুরে বেড়াতে পারব না—তা করতে গেলে মারা যাব, দ্বিতীয়তঃ আমার রাজপুতানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ আমাকে পেলে তাঁদের কাছেই ধরে রেখে দেবেন, পাশ্চাত্য দেশে যেতে দেবেন না। সুতরাং আমার মতলব ছিল, আমার বন্ধুদের অজ্ঞাতসারে কোনও নূতন লোককে ধরা। কিন্তু মাদ্রাজে এই বিলম্ব হওয়ার দরুন আমার সব আশা ভরসা চুরমার হয়ে গেছে। এখন আমি অতি দুঃখের সহিত ঐ চেষ্টা ছেড়ে দিলাম—ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক। এ আমারই প্রাক্তন—অপর কারও দোষ নেই।···

যদি ম-মহারাজ আমাকে পাঠায়। 'যদি' বলছি তার কারণ আমি '—' রাজার অঙ্গীকার বাক্যে বড় নিশ্চিত ভরসা রাখি না। তারা তো আর রাজপুত নয়, রাজপুত বরং প্রাণ দেবে, কিন্তু কখনও কথার খেলাপ করবে না। যা হোক, 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'—অভিজ্ঞতাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক।"

তবে খেতড়ির রাজা স্বামীজীর পাশ্চাত্য যাত্রার সংকল্পে বাধা দেবেন না তা তিনি জানতেন।

২৭শে এপ্রিল ১৮৯৩ ডাঃ নাজুন্ত রাওকে খেতড়ি থেকে লিখেছেন—"মাদ্রাজ হইতে জাহাজে উঠিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উহা এক্ষণে আর হইবার যো নাই, কারণ আমি পূর্ব্বেই বোম্বাই হইতে উঠিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি···রাজা অথবা আমার গুরু ভাইগণ আমার সংকল্পে বাধা দিবেন, তাহার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজাজীর তো আমার প্রতি অগাধ ভালবাসা।"

জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে ঐ ২৭শে এপ্রিল ১৮৯৩ই লিখছেন—

"খেতড়ীর রাজাজী আমায় দেখবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; সুতরাং আমাকে খেতড়ী আসতেই হল।" এখানে বলে রাখা উচিত মনে করি, যে স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্যগণ এবং মহীশূর ও রামনাদের মহারাজার ঐকান্তিক ইচ্ছা, চেষ্টা, এবং সক্রিয় সহযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। বিশেষ করে আলাসিঙ্গা পেরুমল স্বামীজী অন্ত প্রান ছিলেন এবং স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার পরেও তিনি চিরকাল তাঁর পরম অনুগত শিষ্যই ছিলেন। স্বামীজীর সংকল্প বাস্তব রূপায়ণের জন্য আলাসিঙ্গা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরেছে, তাঁর প্রতিটি ইচ্ছা পূরনের জন্য আলাসিঙ্গা সর্বদা একপায়ে খাড়া। তাই তাঁর অথবা অন্যান্য মাদ্রাজী শিষ্যদের আগ্রহ, অথবা সদিচ্ছার কোনও অভাব ছিল না। অভাব ছিল সামর্থ্যের—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেও পাশ্চাত্য যাত্রার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তাই ভবিতব্য মহারাজা অজিত সিংকে প্রেক্ষাপটে এনেছিল। এবং জগৎ সভায় বিবেকানন্দকে সম্ভব করেছিল।

* * *

দু'বছর হল স্বামীজী খেতড়ী থেকে চলে গেছেন। তাঁর সংবাদ খেতড়ি রাজ পাচ্ছেন না। তিনি জানেন না স্বামীজী এখন কোথায়। ইতিমধ্যে স্বামীজীর আশীর্বাদে রাজাজীর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। নাম জয় সিং। তার জন্মের উৎসব হবে। সে উৎসবে রাজাজীর শ্রেষ্ঠ সখা এবং গুরু স্বামীজী না উপস্থিত থাকলে চলে না। রাজাজী তাই এই উৎসবে গুরুজীকে আমন্ত্রণ জানাণোর জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন।

এমন সময়ে ভাগ্যচক্রে মহেন্দ্রনাথের লেখা একটি পত্র এসে পৌছল। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমার ভ্রাতার সংবাদ দিন পনেরো আগ পেয়েছি। তিনি এখন মাদ্রাজে আছেন।"

কালবিলম্ব না করে রাজাজী তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং তাঁর রাজ্যের

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, মুন্সী জগমোহনলালকে মাদ্রাজে পাঠালেন স্বামীজীকে নিয়ে আসার জন্য।

জীবনীকারেরা বলেছেন, "তিনি মাদ্রাজ পৌঁছে মিঃ ভট্টাচার্য্যের (মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য) বাড়ীতে স্বামীজীর দেখা পেলেন। তাঁকে দেখে স্বামীজী অবাক হলেন এবং তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কারণটি যখন জগমোহন-লাল বুঝিয়ে বললেন তখন স্বামীজী বললেন—জগমোহনজী ৩১শে মে তারিখে আমি আমেরিকা যাত্রা করব। সেজন্য প্রস্তুত হচ্ছি। মাত্র একমাস সময় আছে। এখন কিভাবে আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাই?—কিন্তু জগমোহনলাল নাছোড়। তিনি জেদ ধরে রইলেন—স্বামীজী একদিনের জন্য হলেও আপনাকে খেত্‌ড়িতে যেতে হবে। না হলে মহারাজ অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়বেন। আপনার পাশ্চাত্যযাত্রার ব্যবস্থাদির জন্য কোনও রকম চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। মহারাজা স্বয়ং সে ভার নেবেন। আপনি শুধু একটি বার চলুন—"

মুন্সী জগমোহনলাল অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। মাদ্রাজ পৌঁছে তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর শিষ্যরা যে অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছে তা তাঁর জাহাজ ভাড়া এবং আনুষঙ্গিক খরচের জন্য যথেষ্ট নয়। এও তিনি বুঝেছিলেন যে এই দুশ্চিন্তাই স্বামীজীকে পীড়া দিচ্ছে। তাই নিজেই দায়িত্ব নিয়ে তিনি স্বামীজীকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাঁর পাশ্চাত্য যাত্রার সব ব্যবস্থা মহারাজা অজিত সিং করবেন।

স্বামীজী এ প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন এবং ওয়াক্যাত্‌ রেজিষ্টার থেকে দেখা যায় তিনি খেত্‌ড়িতে ছিলেন ২১শে এপ্রিল ১৮৯৩ থেকে ১০ই মে পর্য্যন্ত। যাতায়াতের সময় নিয়ে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ তিনি কাটিয়ে ছিলেন এ যাত্রায়।

গুরুত্বপূর্ণ পাশ্চাত্য যাত্রার দুশ্চিন্তায় যিনি বিহ্বল, সে যাত্রার ব্যয়ভারে অনিশ্চয়তার দুঃখে যিনি মুহ্যমান, তিনি যে সব তোড়জোড় ছেড়ে দিয়ে একবাক্যে জগমোহনলালের সঙ্গী হলেন তার একটিই মাত্র কারণ হতে পারে।

মুন্সীজীর আশ্বাসবাক্যে এবং মহারাজের ঐকান্তিকতায় স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস। মুন্সীজী আশ্বাস দেওয়ার পর স্বামীজী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে যাত্রারম্ভে আর কোনও বাধা আসবে না! মহারাজ সব ভার নিয়ে তাঁর গুরুদেবকে চিন্তামুক্ত করলেন।

বেনীশঙ্করজী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি পত্র আবিষ্কার করেছেন। মহারাজ লিখেছেন মুন্সী জগমোহনলালকে।

চিঠিটি পড়লে মনে হয় স্বামীজীর দুরবস্থার কথা তিনি মহারাজকে জানিয়েছিলেন এবং যাত্রার ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে অনুরোধও করেছিলেন। কিন্তু চিঠির এই উত্তর পাওয়ার আগেই তাঁকে স্বামীজীকে আশ্বস্ত করতে হয়েছিল। তা তিনি করেছিলেন কারণ তিনি নিজেকে চিনতেন, মহারাজাকে অন্তরঙ্গভাবে জানতেন এবং স্বামীজীকে বুঝেছিলেন।

এই চিঠি পড়লে বোঝা যাবে যে স্বামীজীর বিদেশযাত্রার আয়োজন তখনও অসম্পূর্ণ এবং তাঁর মাদ্রাজী শিষ্যেরা চাঁদা তুলে যাত্রার খরচ জোগাড় করার চেষ্টা তখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। আরও বোঝা যায় দক্ষিণী রাজারা কোনও প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিতে পারেন নি।

পূর্বে যখন মাদ্রাজী শিষ্যদের সংগৃহীত পাঁচশো টাকা স্বামীজী দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন "শিষ্যগণ, আমি মায়ের ইচ্ছা পরখ করতে চাই। মাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমার পাশ্চাত্যে যাওয়া তাঁর ইচ্ছা। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় অর্থ আবার আপনিই আসবে।"

মায়ের ইচ্ছায় অর্থ কিভাবে আপনিই এসেছিল এই চিঠিটি পড়লে তাও বোঝা যাবে।

পত্রটি সম্পূর্ণ তুলে দিলাম--

খেতড়ি, ১১,৪,১৮৯৩

প্রিয় জগমোহন,

আপনার দীর্ঘ পত্রটি আজ সকালে পেলাম। আপনার মূল বক্তব্য :

১। স্বামীজী একজন অসৎ ব্যক্তির প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করেছিলেন

২। রামনাদের রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করতে ইতস্ততঃ করেছেন

৩। আপনার সন্দেহ আছে আমরা কমপক্ষে ৩০০০, টাকা দিতে পারব কিনা। সভাসদদের কথা চিন্তা করে এবং পবিত্র স্বামীজীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁরা কি ভাবেন তা ভেবেই আপনার এই সন্দেহ

৪। স্বামীজীর ভগতা (শিষ্যরা) তাঁর সমুদ্রযাত্রার জন্য চাঁদা তুলছে

৫। এভাবে চাঁদা তুলে সম্পূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করা যাবে বলে আপনার মনে হয় না কারণ আপনি বলেছেন স্বামীজী পদব্রজে আফগানিস্থানের পথেও যাত্রা করতে পারেন।

৬। স্বামীজী সত্যই ইওরোপে যেতে চান

৭। এখানকার লু, গরম বাতাসে স্বামীজীর কষ্ট হবে বলে আপনি আশঙ্কা করছেন।

৮। আপনি সঙ্কটে পড়েছেন বলে মনে করছেন

যা হোক্, অন্যান্য সংবাদের মধ্যে এগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। আমি বেশী লিখব না, শুধু প্রয়োজনীয় কথাগুলিই লিখছি।

ইওরোপ যাত্রার প্রশ্নে স্বামীজীর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত কারণ মহতী কর্মযজ্ঞ সেখানে তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। স্বার্থচিন্তা করা আমার উচিত নয় কিন্তু আমি সুখী হব, তৃপ্তি পাব, যদি পৃথিবী এমন একজনের কাছ থেকে সারবস্তু গ্রহণ করতে পারে যাঁকে গুরু বলে ডাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

টাকা দেওয়ার ব্যাপারে একমাত্র বাধা আপনি যা ভেবেছেন তাই। রাজ্যের লোকেদের সমালোচনার কথাই বলছি।

আমি অন্য উপায়ের কথা ভেবেছি। তা হল এই যে 'হুকুম খরচ' (ব্যক্তিগত ভাণ্ডার) থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়ার অসুবিধা নেই। যদিও লোকে অনেক কিছু ভাবতে পারে। আমরা আনন্দ পাব এই ভেবে যে এই কটি টাকা এত সুন্দর একটি কাজের জন্য ব্যয় হয়েছে। লোকে যা বলে বলুক। তাদের বলার কি আছে যখন তারা জানে যে এই সামান্য অর্থ শুধু জাহাজ ভাড়া এবং পথখরচের জন্যই দেওয়া হচ্ছে?

সেদিন এই পর্য্যন্তই লিখতে পেরেছিলাম। শুক্রবার আপনার কাছ থেকে দুটি টেলিগ্রাম পেলাম। তারপর এই চিঠি পেলাম যাতে আপনি টাকার ব্যাপারটি খোলাখুলি লিখেছেন। আপনি অনেক চিঠি লিখেছেন কিন্তু আপনার ফিরে আসতে কেন দেরী হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমাকে অন্ধকারে রেখেছেন। এখন আমি বুঝতে পারছি প্রশ্নটা শুধুমাত্র টাকারই ছিল। যদি আপনি আগে আমাকে জানাতেন তাহলে অনেক আগেই আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারতাম। ঠিক সময়ে পৌছবে না ভেবে আমি আপনাকে চিঠি লিখিনি কারণ প্রায় প্রতি চিঠিতেই আপনি আমাকে লিখছেন 'শীঘ্রই ফিরছি'। এতখানি সময়

বৃথা যেতে দেওয়া আপনার পক্ষে উচিত হয়নি।

এখন স্বামীজী নিশ্চয়ই গরমে কষ্ট পাবেন। অতিথি অভ্যাগত যাঁরা এসেছেন এবং এখনও যাঁরা আসছেন তাঁদের দেখাশোনা করার চাপে আমারও আজকাল মাথার ঠিক নেই। 'শিকারের' রাও রাজা সাহেব আট তারিখে এসেছেন এবং—তারিখে যাবেন। তিনি সঙ্গে এগারো শো অনুচর নিয়ে এসেছেন।

শিশু রাজকুমারও গত দশদিন ধরে অসুস্থ। সেজন্যও মনটা খারাপ।

কাজেই আপনি বুঝতে পারছেন বিচ্ছিন্ন এই ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যে, অসহ্য গরমে কতবেশী চিন্তা আমাদের একত্রে ভারাক্রান্ত করছে।

যা হোক্, অবান্তর কথা বেশী লিখব না।

আপনাদের নিয়ে আসার জন্য সওয়ারীরা রেওয়াড়ী যাচ্ছে। তাদের হাতে এই পত্র দিলাম। এক্ষুনি আপনাকে একটি টেলিগ্রাম দিয়ে বলেছি—গরমে যদি এখানে কষ্ট হবে বলে মনে হয় তাহলে স্বামীজীকে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না।

এখন আর অধিক সময় নেই। আসল কথা হল টাকার জন্য মোটেই চিন্তা করবেন না। আমি ব্যবস্থা করব এবং কথনই পিছিয়ে যাব না। দ্বিতীয় কথা স্বামীজীর যদি কষ্ট হয় তাহলে এখানে নিয়ে আসার জন্য জোর করবেন না।

আপনার

মুন্সী জগমোহনলাল — অজিত সিংহ

রেওয়াড়ী

এ চিঠি নিজেই কথা বলছে। এর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

মহারাজ শুধু যে স্বামীজীর জন্য জাহাজে আসন সংরক্ষণ করেই, সন্তুষ্ট ছিলেন তা নয় বিদেশে বা দেশে যখনই কোনও রকম অসুবিধে হয়েছে তিনি গুরুর পাশে দাঁড়িয়েছেন। স্বামীজীও বোধ হয় পৃথিবীতে এই একজনকেই নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা বলতেন।

শুধু স্বামীজী এবং তাঁর পরিবারই নয় স্বামীজীর গুরুভাইয়েরা এবং পরিচিত জনেরা প্রয়োজনে প্রায়শঃই মহারাজের সাহায্যপ্রার্থী হতেন। পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের খেত্‌ড়ি যেতে বলতেন বিশ্রাম এবং আরোগ্যলাভের জন্য। মহারাজ সর্বতোভাবে তাঁদের দেখাশোনা এবং সাহায্য করতেন।

আমেরিকায় স্বামীজীর ব্যয় নির্বাহের জন্য পথখরচ ছাড়াও রাজাজী তাঁকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। এই টাকা দেওয়া হয়েছিল 'সার্কুলার নোট' এর মাধ্যমে 'থস্ কুক এণ্ড সন্স—ট্রাভেল এজেণ্ট এর সৌজন্যে।

ধর্মমহাসভা শুরু হবার কয়েকদিন আগে স্বামীজী 'সার্কুলার নোটগুলি হারিয়ে ফেলেন। মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে একথা জানতে পেরে রাজাজী তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেন। এ সংক্রান্ত টেলিগ্রামের কপি বেনীশঙ্করজী আবিষ্কার করেছেন—

"খেতড়ির রাজার বিলম্বিত বার্তা টমাস কুক এণ্ড সন, ট্যুরিষ্টস, ফোর্ট, বম্বে'র প্রতি—দয়া করে আপনাদের প্রযত্নে, বণ্টন, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দকে পাঁচশো টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন যে টাকা বম্বে এজেণ্ট আপনাদের দেবে। সার্কুলার নোট হারিয়ে গেছে কি না এবং কত টাকা কিভাবে প্রয়োজন ভট্টাচার্য্যর মারফৎ আমাকে জানাতে বলুন কারণ আমি, প্রেরক, দুশ্চিন্তায় আছি।"

৩০.৮.৯৩

খেতড়ি

খেতড়ির রাজার বিলম্বিত টেলিগ্রাফ বার্তা মামরাজ রামভগত, চিরাওয়া, মারওয়াড়ী বাজার বম্বে'র প্রতি—

তৎক্ষণাৎ পাঁচশো টাকা এবং অতিরিক্ত অন্যান্য মূল্য টমাস কুক এণ্ড সন, ট্যুরিষ্ট, কোর্ট, বম্বে'কে দিন, তাঁদেরকে প্রেরিত সরাসরি বার্তা অনুযায়ী স্বামী বিবেকানন্দ, আমেরিকার কাছে বিদেশী ড়াকে পাঠানোর জন্য।

খেতড়ি থেকে জয়পুরে উকিল সাহেবের কাছে, প্রেরনার্থ

৩০.৮.৯৩

খেতড়ি—খেতড়ী

১, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

প্রিয় ভট্টাচার্য্য সাহেব,

৩০, তারিখে আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি এবং ওইদিনই জয়পুর টেলিগ্রাফ অফিস থেকে মেসার্স টমাস কুক এণ্ড সন, ট্যুরিষ্ট, বম্বেকে পাঠানোর জন্য একটি বার্তা পাঠিয়েছি। আমি তাদেরকে টেলিগ্রাফ মারফৎ পাঁচশো টাকা (যা

আমার বন্ধু এজেন্টকে টেলিগ্রাম করে তাদেরকে দিতে বলেছি।) তাদের প্রযত্নে স্বামীজীকে বষটন, আমেরিকায় দিতে বলেছি। আরও বলেছি কত টাকা কিভাবে দরকার এবং সার্কুলার নোট হারিয়ে গেছে কি না আপনার মারফৎ জানাতে।

ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে যেহেতু 'টেলিগ্রাফ মানি অর্ডার' এর সুবিধা নেই তাই আর কি করতে পারতাম জানি না!

স্বামীজীর উত্তর পেলে প্রয়োজনে আরও টাকা পাঠাব।

আপনার

অজিত সিং

অবশেষে, সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি, ৩১শে মে ১৮৯৩ এসে পড়ল। জাহাজঘাটায় সেই মনোজ্ঞ দৃশ্যটির বর্ণনা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তাঁর জীবনী-কারেরা যেভাবে দিয়েছেন তা হৃদয় স্পর্শ করে। দুটি লেখা থেকেই কিছু কিছু তুলে দিলাম। (স্বামীজীর পরিচ্ছদ নিয়ে লেখা দুটির মধ্যে একটু অমিল আছে—মহেন্দ্রনাথ বলেছেন স্বামীজীর পরনে ছিল 'জুতা ও বুট, ট্রাউজার এবং একটি লম্বা কোট।'

জীবনীকারেরা বলেছেন তাঁর পরনে ছিল 'গেরুয়া রংয়ের সিল্কের আলখাল্লা এবং পাগড়ী'।

এই দুই বেশেই স্বামীজীর বহু ছবি সংরক্ষিত হয়েছে, কাজেই দুটির যেটিই সঠিক হোক্ না কেন বর্তমান লেখার প্রেক্ষিতে সে দ্বন্দ্ব অপ্রাসঙ্গিক)

মহেন্দ্রনাথ দত্ত—"জাহাজে স্বামীজীর বিদেশ গমন ও মুন্সী জগমোহনলালের সহিত কথা-স্বামীজীর জাপানে যাইবার জন্য পি এণ্ড ও কোং এর এস এস পেনিকস্থলা জাহাজে প্রথম শ্রেণীর টিকিট লওয়া হইল। মুন্সী জগমোহনলাল, আলাসিঙ্গা এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তি জাহাজে তুলিয়া দিতে সঙ্গে যাইলেন। স্বামীজীর আর গৈরিক বসন, নগ্ন পদ নাই; জুতা ও বুট পরিয়াছেন, ট্রাউজার পরিয়াছেন এবং একটি লম্বা কোটও পরিধান করিয়াছেন। স্বতন্ত্র ব্যক্তি স্বতন্ত্র ভাব। স্বামীজী উন্মনা বিমনা হইয়া জাহাজের ডেকে পাইচারী করিতেছেন এবং একবার ভারতবর্ষ ও একবার আমেরিকা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে আসিতেছে। কখন বা তিনি ধীরে ধীরে পাইচারি করিতেছেন, কখন বা স্থির হইয়া

দাঁড়াইতেছেন, মাঝে মাঝে একটা চুরুট লইয়া টানিতেছেন কিন্তু কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন না।

মুনসী জগমোহনলাল স্বামীজীকে পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিয়াছিলেন এখন কিন্তু অন্য বেশে দেখিলেন। মুনসী জগমোহনলালের ধারণা ছিল যে তিনি নিজে রাজ তরফ হইতে অনেক ইংরাজের সহিত মিশিয়াছেন সেইজন্য ট্রাউজার, জামা, বুট পরা প্রভৃতি প্রথা তাহার বেশ ভাল রকম জানা আছে। সেইজন্য স্বামীজীকে সতর্ক করিয়া ট্রাউজার পরিবার প্রথা শিখইয়া দিতে লাগিলেন। স্বামীজীর ট্রাউজার পায়ের শেষটা জুতার গোড়ালীতে ঠেকিয়াছিল। মুন্সী জগমোহনলালের ধারণা ছিল যে ট্রাউজারের শেষটা জুতা হইতে দুই তিন আঙ্গুল উঁচুতে থাকিবে কারণ তা না হইলে ভিতরকার মোজা দেখিতে পাওয়া যায় না সেইজন্য স্বামীজীকে অনবরত সতর্ক করিয়া দিতে লাগিলেন, "স্বামীজী ট্রাউজারটা ঐ গোড়ালীতে ঠেকিল; একটু উঁচু করে পরুন।"

"স্বামীজী কিন্তু আপন মনে পায়চারী করিতে লাগিলেন, কথাটা এত কানে যায় নাই। মুনসী জগমোহনলাল বারংবার বলিবার পর কথাটা স্বামীজীর কানে যাইল এবং একটু যেন তাঁহার হুঁশ হইল। তখন স্বামীজী মুন্সী জগমোহনলালের কথা শুনিয়া নিজের পায়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুন্সী জগমোহনলালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমি বাল্যাবস্থাতেই এইরূপ পোষাকে অভ্যস্ত, এ বিষয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার তোমার কোনও আবশ্যক নেই।' কথাটি এমন তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়াছিলেন যে মুন্সী জগমোহনলাল একটু অপ্রস্তুত ও ভীত হইয়া পশ্চাৎ দিকে হটিয়া আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর একটিও কথা কহিলেন না।

অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া চলিয়া যাইল। এই গল্পটি আলাসিঙ্গা বলিয়াছিল।"

জীবনীকারেরা—"অবশেষে সেই দিনটি এল ৩১শে মে ১৮৯৩। সেই জাহাজ, বিদায় সম্ভাষণ, বিদেশযাত্রার নানা দুশ্চিন্তা, সন্ন্যাসী হিসেবে এ সব কিছুতেই তিনি অনভ্যস্ত, এ সবই তাঁর কাছে নতুন। এ ছাড়া সঙ্গীদের আগ্রহে তাঁকে পরতে হয়েছিল, সিল্কের একটি গৈরিক আলখাল্লা এবং পাগড়ী। সত্যই, তাঁকে রাজকুমারের মতই দেখাচ্ছিল।

কিন্তু নানা চিন্তায় হৃদয় তখন তাঁর ভারাক্রান্ত। জগমোহনলাল এবং

আলাসিঙ্গা পেরুমল তাঁর সঙ্গে জাহাজের পাটাতন পর্য্যন্ত গেলেন এবং শেষমুহূর্ত পর্য্যন্ত জাহাজের গম্ভীর ঘণ্টা না বাজা পর্য্যন্ত থাকলেন।

শেষে যখন বিদায়ের বেলা এল তাঁদের চোখ জলে ভরে উঠল।

স্বামীজীর চরণে তাঁরা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন লুটিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে জাহাজ ছেড়ে চলে এলেন। জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলল।

মিঃ ছবিল দাস, যিনি স্বামীজীকে বোম্বাইতে আতিথ্য দিয়েছিলেন তিনিও একই জাহাজে গেলেন।

* *

বন্দরের কাল হল শেষ। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দূরে বিলীয়মান ভারতভূমির দিকে তাকিয়ে স্বামীজী ভাবলেন—ত্যাগের রাজ্য ছেড়ে ভোগের রাজ্যে চললাম—।

কিন্তু বিধাতাপুরুষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, কোনও ভোগ তাঁর কপালে লেখেননি। তিনি তখন জানতেন না জীবনের আর মাত্র নয়টি বছর বাকী।

এই নয় বছর কাটবে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, অমানুষিক কষ্ট, সর্বগ্রাসী হতাশা, আপোষহীন সংগ্রাম, এবং বিরামহীন কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে। বিশ্রাম কি জিনিষ এই নয় বছরে তিনি জানবেন না। কর্মত্যাগ একদিনের জন্যও হবে না।

একাধিকবার গুরুভাইদের কাছে লেখা চিঠিপত্রে টেনিসনের একটি কবিতার দু'টি পংক্তির বাংলা অনুবাদ তিনি ব্যবহার করেছেন—

"কেন প্রশ্নে আমাদের নাই অধিকার, কাজ কর করে মর, এই হয় সার—"

নয় বছরের বাকী জীবনটা তিনি কাজ করেই মরেছিলেন।

স্বামীজীর নিজের কথায় তিনি 'ঘনীভূত ভারতবর্ষ।'

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অপস্রিয়মান ভারতভূমির দিকে তাকিয়ে তিনি ভারতের কথাই ভাবছিলেন—

ভাবছিলেন, মহান ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, পরম্পরা, সংস্কৃতি, ঋষিকুল, শাস্ত্রসম্ভার, ধর্ম এবং নিদারুন দুর্দশার কথা, স্মরণ করছিলেন, গুরুমহারাজকে, শ্রীশ্রীমাকে, সুদূর বরানগরের গুরুভাইদেরকে, এবং সর্বোপরি সেই জগজ্জননী কল্যাণেশ্বরীকে।

স্মরণ করছিলেন বুদ্ধ, মহাবীর, রামানন্দ, দয়ানন্দ, তুলসীদাস, নিশ্চলদাস, এবং মহারাষ্ট্র, আলোয়ার, নয়নারের দক্ষিণী সাধুদেরকে।

উচ্চনীচ সকলকেই স্মরণ করছিলেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য থেকে লালগুরুর ভাঙ্গী মেথর শিষ্যটিকে পর্য্যন্ত।

বিবেকানন্দের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ভারতের মোগলযুগ জাতীয় পরম্পরারই অঙ্গ, আকবর বাদশা তাঁর দৃষ্টির প্রসারতায় বিশিষ্ট হিন্দু। তাজমহল মার্বেল পাথরে গড়া শকুন্তলা।

তাঁর কণ্ঠে গুরু নানক, মীরাবাঈ এবং মিঞা তানসেনের গান সমান মিষ্টতায় ফুটে উঠত।

পৃথ্বিরাজ, প্রতাপসিং শিব-উমা, রাধাকৃষ্ণ, সীতা রাম, বুদ্ধের কাহিনী সমান উষ্ণতায় বলে তিনি সকলকে চমৎকৃত করতেন।

সাধারণে যেখানে শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনাই দেখতে পায় বিবেকানন্দের উদারচিত্ত সেখানে পরম্পরা দেখতে পেত।

বস্তুর আপনরূপ ছিন্ন করে সৃষ্টির স্বরূপ তিাত দেখতে পেতেন।

প্রব্যক্ত ভারতাত্মাই শুধু নয় বিবেকানন্দ প্রকাশিত জগতাত্মা।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মিঃ ব্যাস রাও বলেছেন—

"জগৎ যখন বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করল, তখনই, দেহাবসানের আট বছর পরে, রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও আবিষ্কার করল। পৃথিবীর মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝল তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ মারফৎ, আর, শুধুমাত্র এই যুবাসন্ন্যাসীর কথার জোরেই তারা শ্রীরামকৃষ্ণকে সত্য বলে মেনে নিল।"

তা তো হবেই। ঠাকুরই তো বলেছেন—"তুই আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি সেখানেই যাব, তুই যা দেখি এখন দিকে দিকে।"

তাই ঠাকুরের নরেন যখন নরেনের ঠাকুরকে নিয়ে চিকাগোর ধর্মসভায় দাঁড়াল, খেতড়ি-নরেশের দেওয়া বিবেকানন্দ নাম নিয়ে, তাঁরই দেওয়া গৈরিক বসন পরে, তখন জগৎবাসীর সাধ্য কি না মেনে থাকে?

—০—